# স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

শৃঙ্গভঙ্গ।—পশুরা গুতাগুতি করিয়া প্রায়ই শিং ভাঙ্গে। শিংয়ের অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট না হইলে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যাইলেও অনেক সময় নূতন শিং উঠিতে দেখা গিয়াছে। শিং ভাঙ্গিলেই বন্ধন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। এক-খানা কাপড় শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঢিলা করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক নিম-তৈল-দ্বারা তাহা আর্দ্র করিয়া দিবে।

জর।—প্রসবান্তর কখনও কখনও গাভী-দিগের অত্যন্ত জর হয়। অভ্যন্তরে বস্তুনিচয় পচিয়া যাইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রসবের একসপ্তাহের মধ্যে জরায়ুর স্ফীতি হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং গাভীর পশ্চাদ্দিকের পদ খঞ্জ হইয়া যায়। পৃষ্ঠে ভর দিলে গাভী বক্র হইয়া পড়ে। রোগটী ভয়ানক স্পর্শাক্রামক। গাভী অপেক্ষা মহিষদিগেরই এই রোগ অধিক হয়। এ রোগের ঔষধ-ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিঃসৃত পদার্থগুলিকে ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিবে। কার্ব্বলিক এসিড জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করিতে হইবে। যে-সকল ক্ষতে ঔষধ লাগাইবার সুবিধা আছে তাহাতে ক্লিসিরিণ এবং কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে। পথ্য মণ্ড, কিন্তু তাহাও হালকা হওয়া চাই। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ আহার দিবে।

চক্ষে বাহ্য বস্তুর পতন।—চরিবার সময় পশুদিগের চক্ষে অনেক বস্তু পতিত হয়, অথবা চক্ষে আঘাত লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহের সৃষ্টি হয়। চক্ষু উঠিলে চক্ষুর পাতা ফুল হওয়ায় চক্ষু বুজিয়া যায়, তাহা হইতে জল কাটিতে থাকে এবং আলোক সহ্য হয় না। এরূপ স্থলে চক্ষে কোমেণ্ট দিবে এবং sub-acetate of lead (সফেদা) দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিবে। চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। চক্ষু অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলে, জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে; অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইলে Calomel দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

রক্তপ্রস্রাব।—রক্তপ্রস্রাব হইলে কোমরে শীতল জলের পটি দিবে এবং sulphuric acid দ্বারা রক্ত রোধ করিবে। সামান্য সামান্য পরিমাণে ক্লিসিরিণ অথবা মসিনার তৈল খাইতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ পথ্য দেওয়া উচিত।

শূলবেদনা।—গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের শূলবেদনা অধিক হয়। বেদনা উঠিলে ষাঁড়টী পদ-দ্বারা পেট পিটিতে থাকে, কখনও উত্থান কখনও উপবেশন করে, অত্যন্ত চঞ্চল হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে থাকে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন, আহারের পর শীতল জল-পান, অতিভোজন অথবা পচা জাব ভক্ষণ ইত্যাদি শূলবেদনার কারণ। এই রোগে এক বোতল দেশী মদ্য পশুটীকে খাওয়াইলে এবং তেজস্কর জুলাপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

উদরাময়।—উদরাময়ে পশুগুলির জলের ন্যায় দাস্ত হয়। এই সময়ে তাহারা অল্পাহারী হয় অথবা তাহাদিগের ক্ষুধা আদৌ থাকে না। তাহারা জাবরও কাটে না। চরাই খারাপ হইলে, রেড়ির খাতা খাইলে অথবা সহসা আহারের পরিবর্ত্তন করিলে এই রোগ জন্মে। মহিষশিশুর পেটে পোকা হইলে উদরাময়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই রোগে দাস্তকর আহার, সামান্য জল, কচিলা এবং যবের ছাতু দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে। অথবা খড়ি ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক), যবের এক আউন্স (অর্দ্ধছটাক), অহিফেন ৪ ড্রাম (১৬ মাসা) এবং গঁদ ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক) একত্র করিয়া যবের ছাতুর সহিত মিশ্রিত-করণান্তর গুলি পাকাইয়া খাওয়াইবে।

আমাশয়।—আমাশয়-রোগে পশুদিগের অন্ত্রের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে ক্ষত হয়। পশু দণ্ডায়মান হইয়া গা মোচড়াইতে থাকে, পিঠ কোঁজা করে, তাহার জলের ন্যায় পেট নামায় এবং তাহার সহিত সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকে। এইকালে গাভীর শুশ্রূষা উত্তম হওয়া চাই। মসিনার কাথ, যবের ছাতু এবং কালমরিচ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ-করণান্তর খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়াই বিধি।

অজীর্ণ।—সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, গাভীকে উত্তমরূপে আহার দিলেও তাহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, গাভীর অজীর্ণ হইয়াছে। বিশৃঙ্খল-ভাবে আহার-দান, অনুত্তম আহার, ব্যায়ামের অভাব, শৈত্য, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণের উদ্ভব হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে জুলাব দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দেশী মদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি, এবং আহারেরও পরিবর্ত্তন চাই। গুড় এবং সিদ্ধি আটার (মোটা ময়দার) গুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার গাভীকে খাইতে দিবে এবং গাভীর মুখে সপ্তাহে একবার লবণ ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

বিষচিকিৎসা।—অনেক সময় মুচিরা চর্ম্মের লোভে অথবা পুরাতন গোয়ালারা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া গাভীকে বিষ দেয়। কেহ কেহ গাভীর গাত্রের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া বিষ প্রয়োগ করে। গাভী বিষাক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিলে, গমের ছাতুতে ডিমের শ্বেতসার মিশ্রিত করিয়া, গুলি পাকাইয়া খাইতে দিবে এবং বমনকারক ঔষধ দিবে। এই সময় তেজস্বী জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের ঔষধ, দেড় সের ঘৃত অথবা দুই পাউণ্ড (১৬ ছটাক) Epsom salt। এই ঔষধটী পূর্ণবয়স্ক গাভীকে দেয়; পরন্তু পূর্ব্বোক্তটীই উত্তম জানিবে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, পেটে পদাঘাত করিতেছে, ঘন ঘন উঠিতেছে ও বসিতেছে, জাবর কাটিতেছে না, আহারেও বীতস্পৃহ রহিয়াছে, পিঠ কোঁজড়াইয়া আছে, উদর স্ফীত হইয়াছে, মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে, চক্ষু ফুলিয়াছে ও একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বটী অধিক স্ফীত হইয়াছে এবং তদুপরি অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হইতেছে। গাভী অপেক্ষা মহিষেরই এইরূপ রোগ অধিক

দেখা যায়। ঔষধ-ব্যবস্থা না করিলে পশুগুলি যন্ত্রণায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ রোগে তৎক্ষণাৎ এক বা দুই বোতল দেশী মদ্য এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) লঙ্কার সহিত খাইতে দিবে এবং জুলাপ দিবে।

সময়ে সময়ে বাছুরদিগের রোগের বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে ক্ষত হয়, ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠে, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহাদের ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে। এরূপ ঘটিলে মুখটীকে ফট্‌কিরির জল-দ্বারা ধৌত করিয়া সামান্য পরিমাণে sulphuric acid এবং ঘৃত অথবা ৪ আউন্স (দুই ছটাক) Epsom salt দাস্ত হইবার জন্য খাইতে দিবে।

অন্ত্রে পোকা হওয়া।—অনেক সময় বাছুরদিগের দুগ্ধ-পরিপাক হয় না। উদরে যাইয়া তাহা উত্তেজনার উদ্ভব করে। মহিষ-শিশু গুলিরই প্রায় এই রোগটী ঘটিয়া থাকে। রোগটীর প্রথম লক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদনন্তর ভয়ানক দাস্ত হইয়া থাকে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে শিশুগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ রোগে তেল বা ঘি ৮ আউন্স (চারি ছটাক) খাওয়াইয়া দাস্ত করাইবে। মসিনার ক্বাথের সহিত সামান্য পরিমাণে লঙ্কা ও তৃই-যবচূর্ণ (যবের ছাতু) মিশ্রিত করিয়া আহার করাইবে। এই রোগে অনেক ঔষধিই চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু নিমপাতা বাটিয়া তাহা লবণ-সংযুক্ত-করণান্তর তাহাতে নিমতৈল মিশ্রিত করিয়া মাতৃদুগ্ধ-পান-কালে দুই বা এক সেকেণ্ড পরেই মুখ টানিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পোকাগুলি প্রথম দুগ্ধ-পানমাত্রেই দুগ্ধের স্বাদে অগ্রসর হইয়া আইসে। এমন সময়ে ঔষধ পড়িলেই তাহার পরদিন পর্য্যন্ত অনেক পোকা বাহির হইয়া যায়। পোকা হইলে বাছুরেরা বর্দ্ধিত হয় না।

ক্ষুরারোগ:—অনেক সময় গাভীদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ এই:—শরীরের উত্তাপের আধিক্য, আহারে বীত-স্পৃহতা, জাবর না কাটা, মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া, ওষ্ঠদ্বয় এত জোরে লাগিয়া যায় যে কোন মতেই খুলে না, পশুটী কাঁপিতে থাকে, প্রায়ই দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে থাকে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য সঙ্ঘটিত হয়, শ্বাস দুর্গন্ধময় হয়, দুই দিন পরে শরীরে ফুস্‌ড়ি নির্গত হয়, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতে থাকে, দানাগুলি বড় হয় কিন্তু স্তন বা বাঁটে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পায়ে ঘা হইবার পূর্ব্বে পশুটী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, এবং সর্ব্বদা পা ছুড়িতে থাকে। পায়ে ঘা হইলে মক্ষিকা পায়ে বসে এবং পশুটী খোঁড়া হইয়া যায়। রোগটী বড়ই স্পর্শাক্রামক। অনেক পশুই এই রোগে মারা পড়ে। এরূপ রোগগ্রস্ত পশুর দুগ্ধ কাহাকেও দিবে না। আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখিবে, অন্যান্য পশুর সহিত মিলিতে দিবে না। ঔষধ:—দুইপাউণ্ড (একসের) Epsom salt মহিষকে এবং ১½ পাউণ্ড (তিন পোয়া) গাভীকে খাওয়াইবে। ইহাতেও যদি জুলাপ না খুলে, তবে দুই সের পুরাতন মাত-গুড় দুই বেলা করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত দিবে। খাদ্য কোমল হওয়া চাই। ফট্‌কিরির জল-দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষুরে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিবে; তাহা

হইলে তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবে না। গোয়ালের মেজেতে চূণ এবং তুঁতে ছড়াইয়া দিবে, কিন্তু আহার দিবার কালে পশুটীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া খাইতে দিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

---

# নারীজীবন।

জীবন উষায়
হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ধূলায় ধূসর হ'য়ে
শিশু বালা যায়,
যা' দেখে আপন চোখে তুলিয়া লইছে মুখে
খাইবার তরে ;
আধ আধ আধ বোলে, কত কি যে মুখে বলে,
কত কি যে করে !
মায়েরে দেখিয়া দূরে হামা দেয় বেগভরে
আনন্দের ভানে ;
জননীও হাসিমুখে ধরেন্ তাহারে বুকে
হৃদয়ের টানে।

তারপর হেরি,—
চপলা বালিকা যায় পথে ঘাটে আঙ্গিনায়
খেলা করি' করি' ;
মুখে বলে কত কথা, বুঝে না মনের ব্যথা,
লাজ নাহি জানে ;
সকল সংসার পাতি' কত খেলে দিবারাতি
সরল পরাণে ;
জননী ডাকিছে তায়—"আয় বাছা বাড়ী আয়",
কেবা শুনে কথা !
খাওয়া দাওয়া ফেলি দূরে, বালিকা নিয়ত ফিরে
সাথীগণ যথা।

তারপর একি !
কেন সে লুকাতে চায়, খেলিতে নাহিক' যায়,
নত রাখে আঁখি !
চপলতা পায় লয়, শান্তভাব জাগয়,
কি ভাবিতে যায় !
বদনে কথা না ফুটে, অধর কাঁপিয়া উঠে
লাজের বাধায় !
নবমীর শশী মত আধ অঙ্গ বিকসিত,
আধ দেয় রেখা ;
মন আধ ফুটে রয়, পূর্ণতার পানে দেয়
চুপি চুপি দেখা !
তারপর সে যে
মন্থরগমনে যায়, কারো পানে নাহি চায়,
আরক্তিম লাজে !
পূর্ণ অঙ্গ বিকসিত, পূর্ণভাব উচ্ছলিত
মদবিন্দু-মাখা,—
যেন বিধাতার হাতে লাবণ্যের তুলিকাতে
প্রেম-ছবি আঁকা !
অন্তর দিয়েছে কারে, নিয়ত হেরিছে তারে
মানস-নয়নে,
সব কাজ ভুলে যায় শুধু তার অপেক্ষায়,—
বাঁধা সে যে প্রাণে !
একি অপরূপ !
তারপর হেরি তার মাতৃমূর্ত্তি অবিকার—
যেন স্নেহকূপ !
ভুলিয়া নিজের কথা ভাবে,—সন্তানের ব্যথা
ঘুচাবে কেমনে !
জীবন করিতে পণ সদা যেন সযতন
তাহারি কারণে ;

চাঁদমুখ হেরি তা'র ভুলে যায় জ্বালা-ভার,
না দেখিলে মরে!
তার সুখে সব সুখ, তার দুখে সব দুখ
ভাবে সে অন্তরে।
কি হেরি আবার!—
ল'য়ে কর্ম্মময় দেহ ভাবিছে সে অহরহঃ
সংসারের ভার!
সে লাবণ্য ক্রমে টুটে, মালিন্য সেথায় ফুটে
কুঞ্চন-রেখায়;
প্রগাঢ় আকার ধরি' প্রেম থাকি' হিয়া ভরি'
মহিমা জাগায়!
রূপমোহ কাটি' যায়, কর্ত্তব্যের ভাবনায়
আলোড়িত চিত;
সংসারের মায়া ল'য়ে সংসার-নায়িকা হ'য়ে
নিয়ত ব্যাপৃত!
তারপর হায়!
কি বিষাদ-মাখা ছবি! তাহার জীবন-রবি
অস্তপথে যায়!
চর্ম্ম লোল, দেহ ক্ষীণ, আঁখি-দুটী প্রভাহীন,
পলিত চিকুর!
পড়িয়া জরার গ্রাসে অন্তর স্মরিছে ত্রাসে
চরণ বিভুর।
সংসারের মায়া ঘিরে বদ্ধ করিবারে তারে,
বৃথা সে প্রয়াস!
একদিন ডাক এল, ছিন্ন করে নিয়ে গেল
সব মায়াপাশ!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# জ্ঞানীর প্রভাব

## বা পিথাগোরাস্।

"এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার,
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা হেরে না হয়ে আধার।"

একচন্দ্র সমুদয় জগৎ-সংসার আলোকিত করে, কিন্তু শত শত তারকাবৃন্দ পৃথিবীর কণামাত্র আঁধারও নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোক জগতের যতটা অজ্ঞানতা দূর করিতে ও উপকার করিতে পারেন, শত শত অজ্ঞ লোক তাহার তিলার্দ্ধও পারে না। আমাদের দেশে একটী প্রবাদবাক্য আছে যে, 'যে ভাল খাইতে জানে, সে অন্যকেও ভাল খাওয়াইতে জানে,' কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে না। আমরা এমনও দেখিতে পাই, অনেকে নিজেকে লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে পৃথিবীতে তিনি ব্যতীত আর কেহ যে আছেন, এ কথা যেন তাঁর মনেই থাকে না। এই সকল আত্মসুখপ্রিয় লোকের দ্বারা জগতের উপকার সম্ভবপর নয়। যাহারা নিজের ন্যায় অন্যের সুখ-দুঃখও অনুভব করেন, তাঁহারাই জগতের জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারেন এবং এইরূপ পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী পুরুষ-দ্বারাই জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন নিজের ন্যায় অন্যের অন্তরের অজ্ঞানতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তারিত হইতে দেখা যায়। এখানে গ্রীস-দেশীয় তত্ত্বদর্শী খ্যাতনামা পণ্ডিত

পিথাগোরাসের জীবনের ঘটনাবলিতে এই কথার প্রামাণ্য দেখিতে পাই।

প্রথম বয়সে পিথাগোরাস জ্ঞানলাভের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান; এবং পরে গৃহে ফিরিয়া পরিবারবর্গকে ও দেশবাসীকে এই আলোক-দানের জন্য বদ্ধপরিকর হন্। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনের প্রভাবে শুধু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ছাত্রগণই জ্ঞানী হন্ নাই, তাঁহার পরিচারকবর্গের জীবনেও তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পিথাগোরাসের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম টিলোগিস ও নিসারকস। ইহাঁরা উভয়েই পিতার ন্যায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। কন্যাত্রয়ের নাম এরিগনোট, ড্যামো ও মাইয়া। এই তিনটী কন্যাই বিদুষীবতী ও তৎকালের আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছিলেন। পিথগোরাসের স্ত্রী থিয়ানোও স্বামীর উপযুক্ত সহচরী ছিলেন। পিথাগোরাসের মৃত্যুর পর থিয়ানো পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের কন্যাদিগের লিখিত কতিপয় গ্রন্থও ছিল। তৎকালে তাঁহাদের সুপবিত্র চরিত্রের প্রভাবে তাঁহারা দেশবাসী ও জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এস্ট্রিয়স্ ও জ্যামোনিকস-নামক পিথাগোরাসের দুইটী ভৃত্য ছিল, এই ভৃত্যদ্বয়ও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

পিথাগোরাস তাঁহার ড্যামো-নাম্নী কন্যাকে স্বপ্রণীত গ্রন্থাবলী অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে-'জীবন যাইলেও এই গ্রন্থ কাহাকেও সমর্পণ করিও না।' এক সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইসকল পুস্তক লইবার জন্য ড্যামোর নিকট উপস্থিত হন এবং বহু অর্থ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পুস্তকগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, 'আমি দারিদ্রক্লেশে নিপীড়িত হই সেও ভাল তথাপি পিত্রাদেশ-লঙ্ঘন করিতে পারিব না।'

পিথাগোরাসের জ্ঞানানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি এতগুলি জীবনে জ্ঞানের দীপ জ্বালিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানানুরাগ মানুষকে যে কতদূর ত্যাগী ও মহাপ্রকৃতি করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জগতের কি মহাকল্যাণ সাধিত হয়, পিথাগোরাসের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীমতী—

---

# ৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গজননীর সুসন্তান, বাঙ্গালীর গৌরব পূত-চরিত্র মনস্বী সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা নবেম্বর, সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিঃ সময়ে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তিনি একপক্ষকাল তাঁহার বাগ-

বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময়ে তিনি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করেন নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী গুরুদাস-বাবু কলিকাতা-সহরে নারিকেলডাঙ্গায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সওদাগরী অফিসের ৫০৲ বেতনে 'বুক-কিপার' ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাসবাবু মাতা-পিতার পুণ্যফলে অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। একমাত্র মাতৃদেবীই তাঁহার পিতা এবং মাতার উভয়েরই কার্য্য করেন। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়ে-দিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ও-গুলি মাটির পুতুল নহে যে, খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে।" তিনি কোনও পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, "ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, 'মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব', কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমন উচিত ঠিক্ সেইটুকু শাসন কর।"—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক্ এই উদাহরণটীই দিয়াছেন :—সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয় শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন। মাতাপিতাকে মিথ্যা-সংসৃষ্ট দেখিলে ছেলের সুশিক্ষা যে হইতে পারে না, সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয়েই এই সূত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার চারিবৎসর-মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম্র দিলেন না; বলিলেন, "আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না"। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই। তুমি বল, 'আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।" অনেক কান্নাকাটি করিলেও এবং ঘরে আম থাকিতেও তিনি তাহা দিলেন না। মারপিট না করিয়া শুধু পাখী পড়ানর চেষ্টার ন্যায় "আম চাহিব না" নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া তাহাই বলাইলেন। শ্বশ্রূদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দিলেই বা!—অত জিদ্ করছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিলেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব। কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে উহা উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশকাল ভাল নয়, ব্রাহ্মণের ঘর।" একান্ত বশীভূতা সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার মধুর ও অতিশয় বিনম্র অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু বলিল, "আম চাহিব না, আষাঢ় মাস।" বাটী শুদ্ধ সকলে একমত না হইলে শৈশবে সুশিক্ষা হয়

না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট 'আপীলে' সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না এবং আদিগুরু মাতাপিতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

গুরুদাসবাবুর মাতা ভোজ্য বা পানীয় দ্রব্য কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলিকীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। 'নিজেরা যাহা খাইব না, ঝি-চাকরকেও তাহা দিব না', তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। এই ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দু-ভাবে অতিসহজে ধরিতে পারিতেন, শুধু দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—"ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।"

গুরুদাসবাবু হেয়ার স্কুলের এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু জেনারল্ আসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে এক শত টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকতায় থাকেন—বাহিরে না যান্। বহরমপুরের আইনাধ্যাপকের কার্য্যে দুই শত টাকা এবং বহরমপুর কলেজে একঘণ্টা গণিত পড়াইলে একশত টাকা পাইবেন বলিয়া সটক্লিফ সাহেব গুরুদাসবাবুকে বিশেষ জিদ করেন। তাঁহার মাতুল মাতার মত পরিবর্ত্তন করাইয়া বহরমপুর যাওয়ার মত করান্। বহরমপুর পৌঁছিলে সেই রাত্রিতেই গুরুদাসবাবুর মোহিনী-নাম্নী পরমসুন্দরী শিশুকন্যার কলেরায় মৃত্যু হয়।

বহরমপুরে গুরুদাসবাবুর সহজেই পসার হয়। টাকা জমাইয়া যখন মাসিক একশত টাকা সুদের কাগজ হইল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে বলিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলির চাকরীর যেন পুরা পেন্‌সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে ঢুকিতে মাতৃদেবীর দ্বারা আদিষ্ট হইলে, গুরুদাসবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। গুরুদাসবাবুর মাতা হাতে নগদ বারশত টাকা রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সুদের টাকা লইয়া প্রতিমাসে দুইশত টাকা খরচ করিয়াও হাইকোর্টের পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৮ অব্দে ঠাকুর ল প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া "হিন্দু-বিবাহ-আইন ও স্ত্রীধন"-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েন; ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়া জানুয়ারী ১৮৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯০৪ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের জজিয়তী করেন; ১৮৯০—৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্‌সলার হয়েন; ১৯০২ অব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিসনের সভ্য হয়েন; ১৯০৪ অব্দে নাইট বা সার উপাধি প্রাপ্ত হন্।

হাইকোর্ট হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া গুরুদাসবাবু দেশের শিক্ষা-সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। ভারতবাসীর প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। তাঁহার অভাবে ভারতবর্ষ আজ একজন প্রকৃত সদুপদেষ্টা হারাইয়াছে। এইস্থান পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। সকল সমাজের সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত;—সকলেই তাঁহার অকপট সরলতা এবং আড়ম্বর-বিহীন জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যা এবং ইংরাজী-চর্চ্চা অসাধারণ ছিল। বড় বড় ইংরাজও তাঁহার ইংরাজী বলিবার বা লিখিবার শক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

গুরুদাসবাবু দুই কন্যা এবং উপযুক্ত চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং" সভার সেক্রেটারী; দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের সভাপতি; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর; হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ মুখোপাধ্যায় গুরুদাসবাবুর এক জামাতা।

[এডুকেশন গেজেট হইতে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।]

---

# গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

সংসার আশ্রমে যেরূপ সুগৃহিণীর প্রয়োজন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ গৃহকর্ত্তারও আবশ্যকতা। "সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।"

ট্যাসিটস্ বলেন, "পরিবারের কর্ত্তৃত্বকার্য্য এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, রাজ্য-শাসনও তাহার সমতুল নহে।" রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে না পারিলে, নৃপতি নিজেই অপদস্থ হয়েন, কিন্তু গৃহস্বামীর অবিজ্ঞতা- ও অসাধুতা-নিবন্ধন পরিজনবর্গের সকলেই কলুষিত ও সন্তপ্ত হয়েন;—এমন কি পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

নির্ব্বোধ লোক সংসারের কর্ত্তা হইলে যত অনিষ্ট হয়, অধার্ম্মিকজন কর্ত্তৃত্ব পাইলে তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। গৃহকর্ত্তার অসাধু চরিত্রে ও কুদৃষ্টান্তে পরিজনবর্গের সকলেই অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। যাহার কার্য্য-সকল অপবিত্র, কথাবার্ত্তায় পাপালোচনা, উপমা-সকল কুভাবে পরিপূর্ণ, তিরস্কার-পর্য্যন্ত অশ্লীল, তাহার পত্নী সন্তানগণ ও পরিজনবর্গ তাহার নিকট হইতে কি শিখিতে পারে? অপবিত্র সংসারে যে কেহ লিপ্ত থাকে, গৃহস্বামীর দৃষ্টান্তের প্রভাবে সকলকেই অল্প-বিস্তর পাপ নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।

এজন্য ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞতা সংসার-ধর্ম্মের

মূলীভূত উপাদান হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞতা যদিও সকল কর্ত্তৃপক্ষের ভাগ্যে না ঘটিয়া উঠে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অনায়াসে ধীরতা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃভাব ও সহৃদয়তা দেখাইয়া সন্তান ও পরিজনবর্গকে ভদ্র এবং কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শান্ত, ধীর, ধার্ম্মিক জন যেখানে গৃহস্বামী সেই সংসারই প্রকৃত সুখময় শান্তি-নিকেতন। অতএব গৃহকর্ত্তার বিজ্ঞতা এবং ধার্ম্মিক হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ না হইতে পারিলেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সংসার-সুখের একমাত্র প্রস্রবণ।

শ্রীমতী—

---

# ঐন্দ্রজালিক।

(রূপক)

বর্ষার সন্ধ্যা। ক্ষুদ্র বৃদ্ধ চড়ুই কড়ি-কাঠের কোটরে বসিয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপন মনে উদাসপ্রাণে অতীত জীবনের আনন্দ-স্মৃতির ধ্যান করিতে-ছিলেন; এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, আদরের নাতি—শ্রীমান্ তরুণচন্দ্র পাখা ঝট-পট্ করিয়া দ্রুত উড়িয়া আসিয়া হাজির! বৃদ্ধ বলিলেন, "কি হে, এমন সময় যে?"

স্বভাবসুলভ-চপলতা-সহকারে বৃদ্ধ পিতা-মহকে বেষ্টন করিয়া, তুড়্ তুড়াতুড়্ শব্দে লঘু নৃত্যে একচক্র নাচিয়া তরুণ ঠাকুর-দাদার গা ঘেঁসিয়া বসিল; চক্‌মকে চাহনিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মুস্কিলে পড়েছি, ঠাকুর-দা, শূন্য ঘরে মন টিকল না, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম্!—"

সবিস্ময়ে ঠাকুর-দাদা বলিলেন, 'কেন হে! বাড়ী শুদ্ধ লোক গেল কোথা?"

তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই আছে ঠাকুর-দা,—কিন্তু—!" একটু থামিয়া বলিল "কেউ নাই, কেউ নাই!—" তাহার এই স্বর ভয়ানক হতাশা-মিশ্রিত!

ঠাকুর-দাদা ভয় পাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ বলিল, "আমার শ্বশুর-ম'শাই এসেছেন, বাবা বৈবাহিককে নিয়ে আসর জাকিয়ে বসে গল্প জুড়েছেন!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির; কাজেই, শূন্য ঘরে…বুঝ্‌লে ঠাকুরদা, কেমন করে টিকি?"

ঠাকুর-দাদা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রক্ষে পাই। এই নিয়ে মারামারি! আমি বলি, বুঝি, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকবে……!" একটু হাসিয়া বৃদ্ধ গোটা-দুই ছোট্ট পরিহাস করিলেন। সে-পরিহাস অত্যন্তই পরিষ্কার, সোজাসুজি। তাহাতে মিথ্যার মিষ্টতা এতটুকুও ছিল না;—ছিল শুধু সুস্পষ্ট সত্যের তীব্র ঝাল!

নাতি অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিব্রত হইয়া

উঠিল। ঠাকুর-দাদা সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, আস্তে আস্তে নিজের পাকা-মাথাটি তরুণের কাঁধের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চপল উচ্ছ্বাস-প্রিয় যুবক,—তোমরা স্বভাবের ওপর এত ভীষণ অস্বাভাবিকতার আতিশয্য এনে ফেলেছ যে, তোমাদের সচেতন প্রাণী বলে ভেবে নিতে আমার সময় সময় দ্বিধা-বোধ হয়!—ওহে উচ্ছৃঙ্খলতা-ধর্ম্মী স্নেহাস্পদ, —সংযম বলে একটা শব্দ সংসারে আছে, শুনেছ কি?—"

মাটীর দিকে চাহিয়া সলজ্জ মুখে তরুণ বলিল, 'বেয়াদবি মাপ কর, ঠাকুর-দা, কান মল্‌চি তোমার কাছে।"

নাতির হাত ধরিয়া বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। ক্ষুদ্র চঞ্চুর অগ্রভাগে সস্নেহে তাহার ললাট-চুম্বন করিয়া কানে কানে বলিলেন, "ওটা নাত্-বৌয়ের দরবারে কোরো বন্ধু! এ-সব অপরাধের জন্য সেই-খানে ক্ষমা চাওয়াই প্রশস্ত বিধি।—"

কথাটা চাপা দিবার জন্য তরুণ জোর গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ, উপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ ঠাকুর্দা!—এখন একটা ভাল গল্প সুরু কর দেখি! বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটী হয়ে যাচ্ছে!—"

বাহিরের বৃষ্টি-সজল স্নিগ্ধপ্রকৃতির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বর্ষার সন্ধ্যা জমিয়ে তোল্‌বার ভার পড়্‌ল এই বৃদ্ধের উপর! বড় অবিবেচনা করলে হে! তরুণদের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য হাসির গান কি ঠিক্ তেমন মধুর সুরে এ বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পারবে!—"

তরুণ বলিল, "পারবে ঠাকুর্দা! ভড়্‌কাচ্ছ কেন? চালিয়ে যাও!—"

করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না বন্ধু, অমন হঠকারিতায় আমি রাজি নই। মনে যখন হাসি নেই, তখন মুখে সেটা ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করলে—চোখের জলের তোড় অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌বে এবং ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত-খামটি-টাও ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে! অতএব ক্ষমা কর।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া তরুণ বলিল, "আমি যে তোমার কাছে গল্প শোন্‌বার জন্যই এসেছি, ঠাকুর্দ্দা! —নিরাশ হয়ে ফির্‌ব?—না হয়, ফাঁদাও একটু!—"

"তাইত—" বলিয়া বৃদ্ধ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিক ক্ষণ কি ভাবিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় খুসী কর্‌বার জন্যে মিথ্যে দিয়ে গল্প বানিয়ে আজ শোনাতে পারব না। একটা সত্য ঘটনা সোজাসুজি বলে যাচ্ছি,—বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ত কান পেতে শোন। তারপর হাসি বা কান্না, যা উচিত বিবেচনা হয়, কোরো।"

স্ফূর্ত্তির সহিত পালক ফুলাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, নখর-কণ্ডূতিকায় মাথার চুল আচ্‌ড়াইয়া, দেহ-প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমান্ তরুণ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। বৃদ্ধ পা-দুইটি গুটাইয়া, বুকে ভর দিয়া বসিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গল্প সুরু করিলেন।—

"সে অনেক দিনের কথা। তখন তোমারই মত আমার বয়স। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের তীব্র জড়তা তখন আমায় আক্রমণ করিতে পারে নাই;—আমি তখন তোমারই মত অমনি অধীর ও চঞ্চল ছিলাম। আজ প্রবীণত্বের গৌরবে পাকা-পোক্ত হইয়া,—

অগাধ আলস্যের মাঝে অটল হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু এখনকার দিনের আলস্য-সম্ভোগ আমি অসহ্য ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম্।

"খাবার খাইয়া পেট ভর্ত্তি হইবার পর, অকারণ ব্যস্ততায় আকাশময় মহা ঔৎসুক্যে ছুটাছুটি জুড়িয়া দিতাম! কখনও বা লম্বালম্বি ছুট কাটাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা দেখিবার জন্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে উধাও হইতাম!—সে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি অসীম উল্লাসময়! মনে অশ্রান্ত কৌতূহল, প্রাণে অদম্য সাহস, শরীরে অপর্য্যাপ্ত শক্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্রোশের পর ক্রোশ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতাম! তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতাম!

"এমনি করিয়া একটানে ছুটিতে ছুটিতে একদিন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের কড়া রোদ্রে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; ভারী ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় একটা লোকালয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে আসিয়া বিষম ঝড় তুলিল! সে ঝড়ের গতিবেগ ঠেলিয়া, পাখা ঝাপ্টা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম! রাত্রির মত একটা আশ্রয় চাই।—প্রাণপণে ছুটিলাম।—নিকটেই একটা মানবগৃহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিনা দ্বিধায় সাম্নের খোলা বাতায়ন-পথে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকটায় চাহিলাম। বৃহৎ ঘরখানা বোঝাই হাজার রকমের নিজ্জীব আসবাব। তা'র মধ্যে একটিমাত্র সজীব মানুষ!—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে বার বার তাহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম,—সে আমায় আদৌ লক্ষ্য করিল না। আমি নিঃশব্দে ফুট্ করিয়া আসিয়া ঘরের কোণে কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় লইলাম সে ইহা জানিতে পারিল না। —জানালার কাছে, অপরিসর ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া, বাহিরের মেঘাড়ম্বরময়ী আকাশের দিকে অসহায় উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে নিস্পন্দ-দেহে পড়িয়া রহিল। দৃষ্টিও তাহার স্থির নিষ্পলক রহিল।

"বাহিরে ক্রমে মেঘের পরে মেঘ জমিল কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিল, চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুত হানিল, তারপর তড়্ বড়্ করিয়া বৃষ্টির কোঁটা পড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে জল আসিতে লাগিল। লোকের নিষ্পলক নয়নে, চেতনার আভস ফুটিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে একটু নড়িল; পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, পড়িয়া গেল। একটা হতাশ যন্ত্রণার ব্যাকুল আর্ত্তনাদ বায়ুস্তরে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে আবার আকাশে বিকট বিদ্যুচ্চমকের সহিত উৎকট কর্কশ বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া গেল। লোকটা এবার আকুল আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল! কড়িকাঠের ফাঁক হইতে গলা বাড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার অবস্থাটা দেখিবার প্রয়াস পাইলাম। ও হরি!—হতভাগ্যটা যে খঞ্জ, রুগ্ন! শুধু কি তাই! তাহার হাত-দুটা! হায় ভগবান্, ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠে তাহার

দশটা অঙ্গুলের একটারও যে চিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

"আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! মরি রে! সেই পরাধীনতার ব্যথা-কুণ্ঠিত মলিন নিষ্প্রভ নয়নে কি শোচনীয় দুঃখের রূপ বর্ত্তমান! ললাটের যন্ত্রণাকুঞ্চন-রেখায় যেন জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—'চির নিরুপায়—ক্রীতদাস'।

"লোকটা প্রাণপণ উদ্যমে অনেক চেষ্টায় উঠিয়া বসিল; তারপর কাঁচের জানালাটা টানিয়া দাঁতে ঘুরাইয়া ছিটকানি আঁটিয়া দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে হাত্ড়াইয়া শয্যার শিয়র হইতে একটা ছোট বোতল দুইহাতে ধরিয়া ঠানিয়া আনিল; দাঁতে করিয়া তাহার ছিপি খুলিয়া তাহার ভিতরের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল।

"ওঃ! ও তবে মদ্যপ! এই ভাবিয়া অসহনীয় ব্যথার সহিত বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। হায়! একেই ত ভগবান্ উহার অদৃষ্টে মহাব্যাধির মৃত্যুর যন্ত্রণা চির-জীবন-ব্যাপী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ব্বোধ লক্ষ্মীছাড়াটা আবার ঐ আত্মঘাত-পাপতুল্য নিদারুণ বিশ্রী নেশার অধীন! ধিক্ ধিক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ধীরে ধীরে তাহার ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে অধীর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কড়িকাঠের নিরাপদ্ কোটর হইতে চ্যুত হইয়া অসাবধানে ঘরের মেজেয় পড়িলে, আমাদের ভয়কাতর শাবকগুলি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার বুকের ভিতর-কার হৃৎপিণ্ডটা তেমনি করিয়া সশব্দ-স্পন্দন দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। নিষ্ফল ব্যগ্রতার উৎ-ক্ষিপ্তভাবে সে শয্যাময় হাত্ড়াইতে লাগিল;—তারপর অসহ্য আবেগে শয্যার উপর আছ-ড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কি নিদ্রার মাঝে, ঠিক্ বলিতে পারি না—তাহার দেহ স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"আমি ভীরু চড়ুই হইলেও তখন মৃগা বয়সের প্রাণী, কাজেই কৌতূহলী। জনশূন্য আলোকহীন গৃহে সেই নিস্পন্দ শায়িত দেহটাকে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল;...একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিঃশব্দে ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নামিয়া আসিলাম; শয্যার শিয়রে বসিলাম। তারপর তুড়ুক্ তুড়ুক্ করিয়া লাফাইয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া তাহার মুখ চোকের অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু হঠাৎ পিছাইলাম! উঃ কি গরম! তাহার ব্রহ্মতালুর ভিতর হইতে অগ্নিজ্বালাময় ভীষণ উত্তাপ বাহির হইতেছে! পালকের জামার নীচে গাত্রচর্ম্মে তাহার তাপ আসিয়া ঠেকিল; চক্ষেঃ নিমেষে চম্পট দিলাম! কড়িকাঠের মাথায় নিরাপদ্ স্থানে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

"সেটা ভীষণ উত্তাপই সত্য; অন্ধকার ঘর-খানা সে উষ্ণ ঝাঁজে যেন আশ্চর্য্য আলোকময় হইয়া উঠিল!—ক্রমেই উত্তাপটা তীব্রতর—স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহা অগ্নি-শিখা-প্রোজ্জ্বল একটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল। তরঙ্গ-স্রোত বহিয়া আসিয়া দেহটার শিয়র দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জমাট বাঁধিল। ক্রমে তাহা

একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মানব-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

"মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল। নর-জগতের উর্দ্ধে যদি কোন অপার্থিব প্রসন্ন সৌন্দর্য্য-মাধুরী থাকে,—সে মূর্ত্তি, বোধ হয়, তাহারই সত্তায় সুগঠিত।

"মূর্ত্তি স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখের ব্যাধি-বিকলাঙ্গ কুৎসিত মানব-মূর্ত্তিটা, বোধ হয়, তাহার চোখে ঠেকিল না!—সে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কাচাবরণ-মণ্ডিত জানালার বাহিরে আকাশের দিকে!—আমি ফড়িকাঠের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না,—সে বাহিরের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া কি দেখিতেছে;—কিন্তু দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখ গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি যেমনই মুগ্ধ-মনোরম, তেমনই শান্ত-কোমল!—

"কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ সজোরে ডানহাত তুলিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম! হরিবোল হরি!.....এতক্ষণ দেখি নাই, এই শান্ত সুকুমার প্রিয়দর্শন মানুষটার হাতে—ঠিক্ যেন তীক্ষ্ণ নৃশংসতা-মাখান একটা ভয়ানক চক্‌চকে উজ্জ্বল ছোরা!

"আমি ভয়ে ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু বুজিলাম, ক্ষণপরে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া গেল!—দেখিলাম, লোকটা সেই শয্যার উপর পতিত অচেতন দেহটার পাঁজরে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

"দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় সজোরে ধড়্‌ফড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হত্যা-কারীটা তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না;—অম্লান বদনে অকম্পিত হস্তে ছোরাটা টানিয়া তুলিল!—

"রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনিয়া তাহাতেই রক্তটা ধরিল। ক্ষণপরে রক্তের পাত্রটা ঘরের মেঝেয় নাবাইয়া রাখিয়া সে জানালার কাছে সরিয়া গেল। বাহিরে ঝড়-জল তখনও চলিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সামান্য আলোক আসিতেছে, দেখিলাম। সেই ক্ষীণ আলোকে রক্তমাখা ছোরাখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বর্গের সন্তোষে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে নত হইয়া যুক্ত করে, মনে হইল, যেন কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিল; তারপর ছোরাটা মুখে পুরিয়া অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিল!

"পরে সরিয়া আসিয়া সে সেই রক্ত-পাত্রটার কাছে বসিল। সরল শিশুর তরল চপল কৌতুকের হাসিতে আবার তাহার সুন্দর মুখ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। ঘরের কোণ হইতে একটা ছোট 'খড়ের নল' কুড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে মুখে লাগাইয়া, সেই রক্তের ভিতর ডুবাইয়া সে 'ফুঁ' দিয়া বুদ্‌বুদ তুলিতে লাগিল!

কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে সেই বিচিত্র-বর্ণের-বুদ্‌বুদ-রচিত কত কি আশ্চর্য্য-বস্তু প্রস্তুত হইল! কি বিরাট তাহাদের আকার! কি চমৎকার তাহাদের উজ্জ্বল শোভা!..... আমি কিছুই বুঝিলাম না, বিস্ময়-স্তম্ভিত-নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম!

"বহুক্ষণ-পরে, একাগ্র মনোযোগে ক্রীড়ারত লোকটা হঠাৎ চট্‌কা ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া উঠিল! তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল! সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল! হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া পূর্ব্বের মত একটা আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল! সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গ-রেখা হিল্লোলিত হইয়া আসিয়া, সেই শয্যা-শায়িত দেহটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সংলগ্ন হইল। ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল!

"মৃতদেহটা নড়িয়া উঠিল! আমি ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থানে ক্ষত-চিহ্ন নাই! আছে শুধু অতি-ক্ষীণ একটু শুষ্ক-শোণিত-রেখা!

"শয্যাশায়িত লোকটা উৎকণ্ঠাকুল নয়নে শুষ্ক মুখে চারিদিকে চাহিল, তারপর প্রাণপণ আকিঞ্চনে উঠিয়া বসিল।—ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া, দুই হাতে উদ্বেগ-স্পন্দিত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেই রক্তের বুদ্বুদ-উদ্ভূত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলার পানে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল!

"রাত্রির কুয়াশা কাটিয়া ভোরের আলোক দেখা দিল।—জানালার কাচের ভিতর হইতে বাহিরের মেঘশূন্য নীলাকাশের একটুক্‌রা মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবিলাম, কোন্ ফাঁক দিয়া বাহির হই? চারিদিকই যে বন্ধ!

"হঠাৎ সশব্দে গৃহদ্বার ঠেলিয়া একদল লোক হুড়্ হুড়্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিচিত্র কণ্ঠে বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল!.....সহস্র তর্ক, যুক্তি, প্রশ্ন, উত্তর, তাহারা যথেচ্ছভাবে আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইল। তার-পর কেহ দম্ভভরে বিদ্রূপ করিল, কেহ ক্রুদ্ধ-স্বরে তিরস্কার করিল, কেহ কঠোর ঘৃণায় ধিক্কার দিল! সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া নির্ব্বাগ্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল।

"উদ্ধত অবজ্ঞায় তাহার পিঠে লাথি মারিয়া, মুখে থুতু ফেলিয়া, দলকে দল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; রহিল শুধু অবশেষের দুইজন।—তাহারা দুইজনেই প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে এবং মনোযোগে এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই ঐন্দ্র-জালিক কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এইবার দুইজনে অগ্রসর হইয়া, প্রসন্ন উল্লাসে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল!

"নির্ব্বোধটা মূকের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল; কিছু বলিল না।

"তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আর একজন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হিংস্র ব্যাঘ্রের কঠোর উত্তে-জনায় সেই নির্ব্বোধটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে সে তাহার বুকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিল।—হতভাগার বুকের চামড়া কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিল! কিন্তু মুখে তাহার এতটুকুও বেদনার চিহ্ন দেখা গেল না! সে শুধু হতভম্ব হইয়া প্রহারকর্ত্তার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া রহিল।

"শুনিলাম, হতভাগ্য নির্ব্বোধ ইহারই অন্ন-পুষ্ট, আশ্রয়ে পালিত—হতভাগ্য ক্রীতদাস।

"পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া, শাসনের বেত্র

আস্ফালন করিয়া প্রভু কর্কশ নিনাদে গর্জ্জন করিলেন.....'এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! অন্নদাতা প্রভুর অনুগ্রহ-ভিক্ষু,ক্রীতদাস-জীবন লইয়া নিভৃত বিরাম-কুটীরের মাঝে মাথা গুজিয়া বিশ্রাম করিবার একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া সে কি না স্বচ্ছন্দে এমন দুঃসহ স্বেচ্ছার স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিবে!—কোন্ সাহসে সে এমন অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিল?'

"ভৃত্য কোনই উত্তর দিল না; মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া নীরব রহিল। প্রভু সদর্পে তাহার মাথায় পদাঘাত করিয়া গেলেন।

"জয়ধ্বনিকারী লোক-দুইজন ত্রস্তিতনেত্রে চাহিয়া ছিল। এইবার তাহারা ব্যথিত ম্লান মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল! তাহার মাথার ধূলা, পিঠের ধূলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে উৎসাহ দিল।—নির্ব্বোধ তবুও কোন কথা কহিতে পারিল না; লাঞ্ছনাহত করুণ-নয়নে নির্ব্বাগ্ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া শুধু দুইটি কোটা তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বুকে খসিয়া পড়িল।

"একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি অন্যায়! ওরা নির্ব্বিচারে তোমার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে গেল?—'

"ম্লান হাসি মুখে টানিয়া, ভগ্নকণ্ঠে নির্ব্বোধ উত্তর দিল—"যেতে দাও বন্ধু,—ওঁরা ওতেই যদি পরিতৃপ্ত হন, হতে দাও।—'

"ফুলের মালা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,'কিন্তু আমরা তোমার মহত্ত্বের অপমান করতে পারব না। আমরা প্রীতিভরে তোমায় এই সম্মানের অর্ঘ্য উপহার দেব।—ধর বন্ধু.....'

"সভয়ে পিছাইয়া নির্ব্বোধ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল,—"না না, বন্ধু, ক্ষমা কর—আমি এ সম্মানের অযোগ্য;—আমি যে এর কিছুই জানি নে!"—

"তাহারা চমকিল! বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—'এই অজস্র ব্যয়িত শোণিত, একি তোমারই পঞ্জর-নিঃসৃত নয়?'

"সে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল "হাঁ—।" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, "এই সুন্দর কীর্ত্তি, এ ইন্দ্রজাল তোমারই স্ব-কর-সৃষ্ট নয়?'—

"ক্ষুণ্ণ বেদনার হাসি হাসিয়া নির্ব্বোধ তাহার সেই কুষ্ঠক্ষত-শীর্ণ অকর্ম্মণ্য হাত-দুইখানি তুলিয়া দেখাইল, এ হাত যে অক্ষম! তারপর দৃঢ়ভাবে মস্তক-সঞ্চালনে নিঃশব্দে জানাইল—"না—!"

"প্রশ্নকর্ত্তা অবাক্ হইয়া গেল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তবে? তবে এ কার কীর্ত্তি? জান, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা? কোথায় তা'র নিবাস?—"

"মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বোধের বুকটা প্রচণ্ড-বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না!—নৈরাশ্যকাতর উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে হতবুদ্ধির মত সে চাহিয়া রহিল।—

"প্রশ্নকর্ত্তা তাহার দৃষ্টি-লক্ষ্যে বাহিরের দিকে ত্রস্ত চকিত কটাক্ষপাত করিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া, কাঁচের জানালা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ব্যস্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিষ্ফল উৎ-

সুক্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু কোথায় কে!—

"নির্ব্বোধ হতাশ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! হায়, সে হতভাগ্য নিজেও জানিতে পারিল না—তাহারই বুক-ভরা বেদনার আবেগ, উন্মাদ-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সতেজ-মস্তিষ্কে যে তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, সেই আগুনেই বিরাট্ চৈতন্যময় এক মহতী মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল!—তিনিই তাহার মানবীয় দেহের দুর্ব্বল বক্ষে, শাণিত কঠিন লৌহ হানিয়া রোগদুষ্ট শোণিত টানিয়া বাহির করিয়া সেই রক্ত মাটীর পাত্রে ধরিয়াছিলেন। তারপর সরল শিশুর চপল কৌতুক-আনন্দে মাতিয়া ঐন্দ্রজালিক ফুৎকারে সেই রক্তে বুদ্বুদ্ গড়িয়া এই আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক-কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন! হায়; ইহারা এখন বাহিরে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতে চায়!—"

* * *

বৃদ্ধ চুপ করিলেন। তরুণ মাথা তুলিয়া সাগ্রহে বলিল, "তারপর?—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তারপর আর কি? খোলা জানালা পেয়ে আমি সুড়ুৎ করে তা'র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়্লুম্, তারপর মুক্ত আকাশের বায়ুপ্রবাহে পাখা-সঞ্চালন করে সন্ সন্ শব্দে নিজের ডেরায় ছুট্লুম্।—"

তরুণ হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"নিজের ডেরায়! পুলীশে খবর দিতে গেলে না? এমন ভয়ানক খুন-জখমের চমৎকার গল্পটা ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়্ল না; গল্পটা মাঠে মারা গেল!—"

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ চড়ুই মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যেতে দাও, সুহৃদ্, জবরদস্তি করে রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে আটকে রেখে বিষজীর্ণ করে মেরে ফেলার চেয়ে মুক্ত আকাশের কোলে খোলা মাঠের মেঠো হাওয়া খেয়ে মরা—ঢের স্বাস্থ্যকর! তুমি এখন নিজের ডেরায় যাও, তোমার শূন্যঘর এতক্ষণ নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে,—রাত্ ন'টা বাজে!

(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। High courts' Instructions to and Regarding Police Officers (পুলিস্-কর্ম্মচারিগণের প্রতি ও তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চ-বিচারালয়-সমূহের বিধি)।—শ্রীযুক্ত এইচ্ ব্যানার্জ্জি, বি এস্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, গ্রথিত ও গিরিধি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এলাহাবাদ, বোম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় উচ্চ বিচারালয়গুলির পুলিস্-সংক্রান্ত বিধি-সমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার সাতটী অধ্যায়ে পুলিস্-কর্ম্মচারী, পুলিসে সংবাদ, পুলিস্ রিপোর্ট, বন্ধন, কারারোধ, জামিন্, অনুসন্ধান, পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি, প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য

বিষয় অতিসুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পুলিস্-কর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ী, আইন-পাঠার্থী এবং পুলিসের শিক্ষাধীনে অবস্থিত ছাত্রগণের পক্ষে যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণেরও জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় ইহাতে বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকারের পরিশ্রম অচিরেই সার্থকতা লাভ করিবে।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২রা নবেম্বর মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা এবং আমাদিগের মাতৃভূমি একটী উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইলাম। মানুষ কেহই চিরদিনের জন্য এখানে আসে না। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী মনীষীর উজ্জ্বল চরিত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশবাসী আগ্রহ-সহকারে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, তাঁহার নিরহঙ্কারতা ও নিরভিমানতা, তাঁহার সেই সরল ও অমায়িক মধুর ব্যবহার, তাঁহার সেই গভীর জ্ঞানানুরাগ ও দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে। স্বদেশবাসীদিগের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক্। বিধাতা তাঁহার চিরোন্নতিশীল আত্মার চির উন্নতি বিধান করুন এবং দেশবাসীকে তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তানুসরণে শক্তি প্রদান করুন।

মহিলাদিগের প্রার্থনা।—আমেরিকার কতিপয় রমণী প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, আমেরিকার কয়েকজন মহিলাকে ইউরোপের শান্তি-সমিতিতে যোগদান করিবার সুযোগ দেওয়া হউক্।

রমণীদিগের এ প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

নারীর কার্য্য।—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ এক প্রকাশ্য সভায় নারীদের কার্য্যদক্ষতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের দশ লক্ষ নারী গোলাগুলি, বন্দুক ও কামানের নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিন লক্ষ বাট হাজার নারী কৃষিকার্য্য, দুই লক্ষ কুড়ি হাজার নারী জল- ও স্থল-সৈন্যের শুশ্রূষা-কার্য্য এবং বহু সহস্র নারী নানাপ্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মন্ত্রিমহোদয় বলিয়াছেন, 'নারীর সাহায্য না পাইলে আমরা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতাম না।'

বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয়া কুমুদিনী দাস।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী কুমুদিনী দাস-মহাশয়া কয়েকদিনের পীড়ায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চিরকল্যাণ বিধান করুন।

---

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 665. January, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৫ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৫। জানুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।


## গানের স্বরলিপি।

তোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী
ঘুচিল বেদনা-জ্বালা,
নিভিল সকল চিত্ত-দহন,
ফুটিল কুসুম-মালা!

দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার,
ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,
( .....শু )
শান্তি-কমল শুভ্র অমল
করিল জীবন আলা!

সংসার-পথে বিচরিব সুখে,
তোমারে ডাকিব সুখে দুঃখে শোকে,
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান,
জীবন—পায়ে দিব ডালা!

( আজ ) দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,
আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি,
আনন্দে আমি তব গান গাহি—
গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২ ৩ ০ ১
II ণসসা -া ণসা । দা ঋপা ঋপা । ঋপা ঋপা ঋপা । ণদা -া পা I
শুনি ০ বা তো মা র অ ন্ত র বা০ ০ ণী

২ ৩ ০ ১
I ঋপা ঋপা জ্ঞা । পঙ্কা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া I
ঘু চি ল ০বে দ না আ ০ ০ লা ০ ০

২ ৩ ০ ১
I ণসা ণসা ণদা । দা ধণা ধণা । সা -া ঋজ্ঞা । ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা I
নি ভি ল০ স ক ল চি ০ ত্ত দ হ ল

২ ৩ ০ ১
I ঋণা দা পা । ঋপা ঋপা ঋপা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ফু০ টি ল কু সু ম মা ০ ০ লা ০ ০

অন্তরা।

২ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
ঘু রে গে ল মো হ তি মি র ভা ০ র

২ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
ঘু চে গে ল ভ য় ছু টি ল আঁ ধা র

২ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । ঋপা পা পা I
শা০০ ০০ন্ তি ক ম ল শু ০ ভ্র অ ম ল

২ ৩ ০ ১
I ঋপা পা জ্ঞা । পঙ্কা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ক রি ল জী০ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

সঞ্চারী।

২ ৩ ০ ১
II ণসা -া সণ্‌ । দা দা ণ্‌ । ণ্‌ সা ঋজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
সং ০ সা০ র প থে বি চ রি ব সু ধে

২ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋমা মা মা । জ্ঞা জ্ঞা ঋা । ঋা সা সা I
তো মা রে ভা কি ব মু খে দু খে শো কে

২ ৩ ০ ১
I পসা -া সদা । পা পা পা । পা পা দা । দা পা -া I
নি র্ ভ য়ে আ মি গা হি মা ব গা ন

২ ৩ ০ ১
I পণা -া দা । পা -া -া । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা সা II
বী ০ ব ন ০ ০ পা য়ে দি ব ভা লা

আভোগ।

২
[ সা সা ]
আ ঙ

৩ ০ ১
II দা মা মা । দা পা পা । পর্সা র্সা র্সা । পর্সা -া পর্সা I
দু খ না হি মো র বে দ ন না ০ হি

২ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা জ্ঞা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা ঋা । ঋা সা র্সা I
আ ন ন্ দে আ জি স বা মু খ চা হি

২ ৩ ০ ১
I পদপা -র্সর্ঋর্সা র্সা । পর্সা র্সা র্সা । পা -া দা । দপা পা পা I
আ০০ ০নন্ দে আ মি ত ব ০ গা ন গা হি

২ ৩ ০ ১
I দপা পা জ্ঞা । পক্ষা দদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II II
গা থি ব দি০ ফু ল মা ০ ০ লা ০ ০

---

# হিন্দুর তীর্থনিচয়।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কাশীদেবীর গামান্ত দূরে উত্তর দিকে ভূতভৈরবের মন্দির আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ ভীমভৈরবও কহিয়া থাকে। ইঁহাকে পূজা করিলে ভূতের ভয় আর থাকে না। ইঁহার বাড়ি আছে। ইঁহার কেবলমাত্র মস্তক ও মুখ দেখা যায়,অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত।

অণ্ডসানগঞ্জ-মহল্লায় বড় গণেশের মন্দির আছে। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বড় সড়ক হইতে একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোণে জগন্নাথদেবের মন্দির। এখানে তিনটী মন্দির আছে। দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলভদ্র, এবং মধ্যে তাঁহাদিগের ভগ্নী সুভদ্রা। প্রথম দুইটীর হস্তের কনুই পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু হস্ত ও পদ নাই। শেষোক্তটি হস্তপদবিহীন। গলির অন্ত কোণের একস্থানে দুইটী সতীমূর্ত্তি অবস্থিত। পুরাকালে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি তাঁহাদিগেরই স্মারক। বড় গণেশের মন্দিরে গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি হস্তিতুণ্ডবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্ত ও পদ রৌপ্যনির্ম্মিত। মন্দির-মধ্যে চারিটী ঘণ্টা দোদুল্যমান।

* * * *

সহরের বাহিরে পশ্চিম দিকে পিশাচ-মোচন নামে একটী সুদীর্ঘ সরোবর আছে। ইহার তটে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। পিশাচমোচন হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসীধামে আগন্তুক-মাত্রকেই এখানে আসিতে হয়। সহরের লোকেরা বৎসরে একদিন এখানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে স্নান করিলে পিশাচদিগের ভীতি আর থাকে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, একজন পিশাচ পবিত্রস্থানের গণ্ডীর মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিতেছিল। পিশাচ-মোচনের পথের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ তাহার পথরোধ করেন। সুতরাং, ঘোর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যুদ্ধে পিশাচই জয়লাভ করে। ক্রমে সে পিশাচমোচনের স্নান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থানে সহরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে ভৈরবনাথ পিশাচের মস্তকচ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি সেই মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে আগমন করেন। মুণ্ডটী দেহহীন হইলেও বাক্‌শক্তিহীন হয় নাই। সেই কাটামুণ্ড বিশ্বেশ্বরের স্তব করিয়া এই বর প্রার্থনা করে যে, তাহাকে সহর হইতে না তাড়াইয়া পিশাচমোচন নামে যেন একটী পুষ্করিণী খনন করা হয় ও গয়া-যাত্রিগণ এখানে যেন প্রথমে আসিয়া স্নানটীকে দর্শন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। ঘাটের উপর মন্দিরের কোণে পিশাচের প্রস্তর-নির্ম্মিত মুণ্ড দেখা যায়। গয়াযাত্রীর মধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বে পিশাচমোচন না দেখিয়া থাকে, তবে গয়ালীগণ তাহাকে বারাণসীর পিশাচমোচন দেখিতে অনুরোধ করে। ইহাতে যাত্রীদিগের কষ্ট হয় দেখিয়া গয়াতে পিশাচমোচনের একটী নকল স্থান কৃত হইল। তথায় স্নান করিলে বারাণসী-ধামের পিশাচমোচনের ফল হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা ব্যতীত বৎসরে পিশাচ-মোচনে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ইহা "লোটাভাণ্টা" নামে খ্যাত। এই দিনে লোকে বেগুনের বেগুনি করিয়া খাইয়া থাকে। ঘাটের পূর্ব্বদিকটি গোপালদাসসাহু এবং অবশিষ্ট স্থানটী মির্চ্চবাই-নামক অনেক মহিলা নির্ম্মাণ করান্।

সরোবরের পূর্ব্বতটে দুইটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ও নক্কুমিশ্র অণ্ডটি মির্চবাই নির্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত মন্দিরের চতুষ্পার্শে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি কুলুঙ্গি দৃষ্ট হয়।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও তাঁহার সন্নিকটে পিশাচ-মোচনের মুণ্ড রক্ষিত দেখা যায়। ইহার পরেই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি চতুর্ভুজ। এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম, তৃতীয় হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে চক্র। ইহাঁর গলে বনফুল-হার। যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু। বিষ অর্থে প্রবেশ, ণ বিশ্ব, উ চৈতন্য। (বিশং ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুরিতি)। বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা যায়। ইহাঁর বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তুভ মণি আছে, তাহাই চৈতন্যভাস, শ্রীবৎসমায়া, যাহাতে জগৎ মোহিত রহিয়াছে। জীবসমষ্টিই বনমালারূপে নানাবর্ণে গ্রথিত। হৈরণ্যপাত্র অর্থাৎ শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ পীতবস্ত্র। যজ্ঞোপবীতই প্রণব, সাংখ্যযোগই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শ্রবণকুণ্ডল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গই প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ। আত্মার উপাসনাতেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পদ্মাকারে মোক্ষবর্গরূপে এক হস্ত হইয়াছে। তমোগুণ সলিল তত্ত্বরূপ-শঙ্খাকারে অর্থবর্গ-রূপে ইহার দ্বিতীয় হস্ত। তৃতীয় হস্তটী রজোগুণ তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন-নামক-চক্রাকারে কামবর্গরূপে পরিণত। প্রাণতত্ত্ব গদা ত্রিগুণময়ী ধর্ম্মবর্গরূপে চতুর্থহস্ত হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কাম, উভয় কর্ম্মই ইহাঁর দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়গণ শররূপে মণ্ডিত। ক্রিয়াশক্তি রথ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভূতবৃত্তি ক্রিয়াশক্তি চক্রকুবরাদিতে ব্যক্ত হইয়াছে। বর আর অভয় দুই মুদ্রা। ধর্ম্ম ও জ্ঞান দুই চামর দুই পার্শ্বে উপবীজন। গরুড় বেদরূপ; কারণ; বেদবেদ্য পরমাত্মাকে সর্ব্ববেদেই বহন করেন্। জ্ঞানস্বরূপা কমলাই চিৎশক্তি-রূপে সন্নিহিতা আছেন। নন্দসুনন্দাদি অষ্টদ্বারপাল; ইহারাই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহই ব্রহ্মপুচ্ছ-চতুষ্টয়। বিষ্ণুর পরেই লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি। ইহাঁর বামভাগে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অবস্থিত।

সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সূর্য্যকুণ্ড আছে। এখানে কূপের সংখ্যা ১২টী; পরন্তু দুইটির মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর উপর একটী মন্দির আছে। ইহার কিছু দূরে সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। এই বিগ্রহটী কোটা-বুন্দীর রাজা স্থাপিত করেন্। রবিবারে এখানে সূর্য্যের একটী বিশেষ করিয়া পূজা হইয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে পরমেশ্বর বলিয়া মানেন্। সৃ গত্যর্থে, ঋ স্থলে উর্। উ-শব্দে গমন। রকারে অগ্নি। য স্বরূপ। অর্থাৎ তৈজস-স্বরূপ, শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র গ বিনি, তাঁহার নাম সূর্য্য। সূর্য্য অর্থে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মাই জ্যোতিঃব্রহ্ম; যথা "ব্রহ্মজ্যোতিঃ রসোঽমৃতমিতি শ্রুতিঃ।" সুতরাং, সূর্য্য-শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। বিশেষতঃ, সূর্য্য-মন্ত্র গায়ত্রীকে সকলে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন্। মন্দিরের মেজেয় হোমকুণ্ড আছে। হোমের জন্যই সেই কুণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমকালে সূর্য্যপুরাণ পঠিত হয়। এই স্থানটী শাম্বাদিত্য নামে খ্যাত। কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের নাম হইতে শাম্বাদিত্য-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা শাম্ব অতিগর্হিত পাপ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে শাপ দেন। ফলে তাহার কুষ্ঠ হয়। শাম্বের মাতা কৃষ্ণকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে, তিনি বলেন, 'যদি শাম্ব বারাণসীধামে যাইয়া পুষ্করিণী খনন-

পূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও সূর্য্য-পূজা করে, তবেই সে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে। শাম্ব তাহাই করেন। এইজন্য পুষ্করিণীর নাম শাম্বাদিত্য।

সূর্য্যকুণ্ডের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অট্টাস-ভৈরবের ভগ্ন মূর্ত্তি অবস্থিত। ঔরঙ্গজেব ইহাঁকে ভগ্ন করেন।

সহরটীর এই মহল্লায় ধ্রুবেশ্বরের মন্দির আছে। ধ্রুব একজন ঋষি। নক্ষত্রের মধ্যে ইহাঁর স্থান। মন্দিরটীতে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে।

* * *

মানমন্দির-ঘাটের যাহা কিছু প্রখ্যাতি আছে, তাহা কেবল নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রাদির জন্য। গঙ্গানদীতটে মন্দিরটী অবস্থিত। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। যে গলি দিয়া গমন করিয়া ঘাটে যাওয়া যায়, তাহাতে দালভীশ্বরের মন্দির অবস্থিত। উক্ত দেবতার মেঘের উপর ক্ষমতা অধিক। দেবতাটী ভূঙ্গার-মধ্যে অবস্থিত। তাহা জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দালভীশ্বরের মন্দিরের সংলগ্নীভূত চতুর্ভুজ শীতলা এবং অন্যান্য দেবতা আছেন্।

নিকটেই সোমেশ্বরের মন্দির। সোম অর্থে চন্দ্রদেব। ইহাঁর মন্দিরের অনতিদূরে বারাহী-দেবীর মন্দির।

মানমন্দিরে ভিত্তিযন্ত্র, যন্ত্রসম্রাট্, চক্রযন্ত্র, দিগংশযন্ত্র প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে। এখান হইতে অনতিদূরে নেপালি মন্দির অবস্থিত। নেপালি মন্দিরের সহিত কোন পৌরাণিকী আখ্যায়িকার সম্বন্ধ না থাকিলেও এবংপ্রকারের মন্দির কাশীতে আর নাই। ইহা ললিতা-ঘাটের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগে দোহরা চৌখুটা ও তদুপরি গিল্‌টি-করা কলস দেখা যায়। বারান্দার দ্বারে বন্দনবাড়ীর ন্যায় ঘণ্টা ঝুলিতেছে। সেই ঘণ্টাগুলি বায়ুদ্বিতাড়িত হইয়া স্বয়ং বাজিতে থাকে। সমক্ষে বড় নন্দী দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নিকটে নেপালিগণের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে।

* * *

মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস। বারাণসীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি। অপর চারিটীর নাম অসিসঙ্গম, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা এবং বরুণাসঙ্গম। তীর্থকামিগণ অসি-ঘাটে ধর্ম্ম-কৃত্যাদি করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসে, এবং তথায় পূজাদি করিয়া মণিকর্ণিকায় গমনপূর্ব্বক কূপে স্নান করে। এখান হইতে তাহারা পঞ্চগঙ্গায় গমন করিয়া পরে বরুণাসঙ্গমে সমাগত হয়।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের প্রবাদ এই যে, একদা হরপার্ব্বতী মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহাদেবের মন সহসা উদ্বেগপূর্ণ হইল। কাশী তখন দিবোদাসের হস্তগত। সমস্ত দেবতাই কাশী হইতে বিতাড়িত হয়। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বারাণসীর সংবাদ আনিতে ও রাজা দিবোদাসকে রাজ্যচ্যুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মার বাহন হংস আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা

তদুপরি আসন-গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজা দিবোদাসের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। রাজা ব্রহ্মাকে চিনিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণবোধে দান দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা ধারণ করিয়াছি, সুতরাং আমি দান গ্রহণ করিব না। যদি দান দেওয়াই আপনার বাসনা থাকে, তবে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপকরণ দিন্; আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে চাই।' রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন যে, যজ্ঞের উপকরণ দিতে রাজার কোনও না কোন ত্রুটি সংঘটিত হইবে এবং অমনি সেই পাপের জন্য তিনি তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। রাজার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সমাপন করিয়া স্থানটীকে 'দশাশ্বমেধ'-নাম দিলেন। এই দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিলে প্রয়াগ-যাত্রার ফল হয়। ব্রহ্মা এখানে দুইটী বিগ্রহ রাখেন; তন্মধ্যে একটীর নাম দশাশ্বমেধেশ্বর এবং অন্যটী ব্রহ্মেশ্বর। প্রথমটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ও বৃহদাকার এবং দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র। প্রবাদ এইরূপ যে, দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। যে-মন্দিরে উক্ত দুই বিগ্রহ আছে, তথায় অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষার্দ্ধে অনেক ব্যক্তি দশাশ্বমেধঘাটে এবং নিকটস্থিত রুদ্রসরোবরে স্নান করে। পনের দিন ব্যাপিয়া পূজাদি চলিয়া থাকে।

দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তিনি যে-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্যের কিছুই হইল না। এদিকে রাজাও তাঁহাকে সমাদরের সহিত তাঁহার জন্য একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তখন কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। শিবের নিকট তিনি আর প্রত্যাগত হইলেন না। ব্রহ্মা হিন্দুর একটি প্রধান দেবতা। সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা অবস্থিত ছিলেন। তিনি আপনার শরীর হইতে প্রকৃতি পুরুষ-জড়িত এক বিরাট পুরুষকে প্রকাশ করেন। সেই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনি আপনি দুই ভাগ হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে ঐ স্ত্রীতে সম্ভোগ-দ্বারা বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করেন। ইহারই অভিপ্রায়ে স্মৃতি-পুরাণাদির প্রজোৎপত্তি-ব্যাপার-বিশিষ্ট ব্রহ্মার কন্যা-হরণ-প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। ইহা রূপকমাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী-মহল্লায় দুইটী মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের প্রখ্যাতি অধিক। তন্মধ্যে একটী মন্দির সিদ্ধেশ্বরীর। ইহাঁর মন্দিরের সংলগ্ন চন্দ্রকূপ নামে একটী কূপ আছে। চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে লোকগণ সমাগত হইয়া কূপে চন্দ্রের পূজা করে। মন্দিরস্থিত দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি দুর্গা-দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাঁর এক হস্তে পদ্ম, অন্যটিতে অসি, তৃতীয়টি সিংহের উপর এবং চতুর্থটী মহিষের উপর। বারান্দার পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ইনিই সিদ্ধিদাতা। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরেরও সঙ্কট-নিবারণের প্রখ্যাতি আছে। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠ আছে। এখানে ব্রাহ্মণবালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া

থাকে। সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিলেই সঙ্কটাঘাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে মহাবীর ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

সঙ্কটাঘাটের উত্তরে রামঘাট। এখানকার সিঁড়ির উপর একটী মন্দির আছে। স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতার সমাবেশ দেখা যায়। দেবতাদিগের পরিধানে কিংখাপের পরিচ্ছদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

---

# কবি-কুঞ্জ।

(১)

কবি-কুঞ্জ, মরি এই কি সুখের স্থান,
ভারতীর লীলাস্থল, সুখের উদ্যান!
হেথায় পঞ্চম স্বরে, কোকিল কুহরে জোরে,
পাপিয়া ললিত গায়, সুখের কেমন!
সুখকর বহে সদা মৃদুল পবন!

(২)

হেথায় কুসুম ফুটে সৌরভ বিলায়,
সাহিত্যের তীর্থযাত্রী ভাবুকে মাতায়;
হেথায় আকাশ-বাসে কোটি চন্দ্র পরকাশে,
সুবিমল রশ্মি-রাশি করে বিতরণ;
চকোর করিয়া পান সুখে নিমগন!

(৩)

প্রকৃতির কুঞ্জে এই বিটপীর দল
ফল-ফুলে সুশোভিত সুন্দর সরল;
লতিকা আনন্দে করে পরিণয় তরু-বরে,
মুকুল-শঙ্খের মুখে ভ্রমর-গুঞ্জন!—
মরি কি সুধার ধারা শ্রবণ-রঞ্জন!

(৪)

বাণীর নিকুঞ্জ এই কিবা রম্য স্থল,
রাতুল চরণে তাঁর শোভে শতদল!
হস্তেতে বীণার তার ঝঙ্কারিয়া অনিবার,
মরি কি সুধার ধারা করে বরিষণ,
ভক্তের পিয়াস মিটে, জুড়ায় জীবন!

(৫)

ছয় রাগ মূর্ত্তিমতী ছত্রিশ রাগিণী,
বাণীরে বরণ করে দিবস-যামিনী;
বাণীর তনয় কবি, প্রকৃতি সরল ছবি,
উৎসব আসবে সব মত্ত অনিবার,
অমৃতের নদী বহে সুখের আধার!

(৬)

শোক তাপ নাহি ভাবে, সব ভুলে যায়,
আপনি মাতিয়ে রসে সবারে মাতায়;
সদাই আনন্দ হেথা, নাহি কিছু মনে ব্যথা,
আনন্দ-আশ্রম এই শুদ্ধ নিকেতন,
বাণীর নিকুঞ্জ এই ত্রিদিব-ভবন।

(৭)

ম্লানজ্যোতি হীরা-মুক্তা, সুদীপ্ত কাঞ্চন,
হেথায় লজ্জিত কাছে বাণীর চরণ;
হেথা যশ প্রতিভার, ঐশ্বরিক ক্ষমতার,
হেথায় কবির রাজ্য, বাণীর আলয়,
কবির গৌরব সদা প্রতিষ্ঠিত হয়!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

# আত্মবিসর্জ্জন।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

( নন্দলালবাবুর বাটী )

( নন্দলাল ও ঘটকের প্রবেশ। )

নন্দ। কিহে, একটা মেয়ে টেয়ে জোগাড় কর্ত্তে পার্লে না ?

ঘটক। সে কি ম'শাই? এত মেয়ে দেখালুম, আপনি ত কোনটাতেই মনোযোগ কর্লেন না!

নন্দ। ছেলের বিয়ে দোব! জান কি, মোটে একটা ছেলে, তা' মনের মতন ঠিক্ না হ'লে ত দিতে পারি না! তবে বিয়েটা আমি শীগ্‌গির দিতে চাই। ছেলেটা 'বিলেত যাব, বিলেত যাব' করে অস্থির হ'য়েছে, সেই জন্যে আমার এত ইচ্ছে যে বিয়ে দিয়ে তবে বিলেত পাঠাই। যদি বিয়ে না দিয়ে পাঠাই, জানি কি, এখনকার সব ছেলে,—যদি বিলেত থেকে একটা মেম্ বিয়ে ক'রে আসে!

ঘট। কই, সেটা বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আগে সেটা হ'ত বটে! সে-কালে লোক বিলেত গিয়ে ক্রীষ্টান হ'ত, মেম বিয়ে ক'র্ত্ত, ফিরে এসে খাস্ সাহেব সাজ্‌ত। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মন সে-রকম নেই। শুনেছি, এখন অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বিলেত গিয়ে কাপড় পরে, একাদশী করে, জপ-আহ্নিক করে। মেম বিয়ে কোরে ক্রীষ্টান হওয়া ত দূরের কথা!

নন্দ। হাঁা, সে-কথাটা মিথ্যা নয় তবে আজকালকার ছেলেরা বাপ্-মার বড় অবাধ্য। বিশেষতঃ, বিয়ে করা সম্বন্ধে! এই সেদিন আমার এক শালীর ছেলে, ছোঁড়া এম, এ, পাশ ক'রেছে, ছোঁড়া কারু কথা শুন্‌লে না—একটা দুঃখী বিধবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

ঘট। ( চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ) তারপর?

নন্দ। তারপর আর কি? এখনকার সব ছেলেদেরই এক দশা! এত ক'রে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালুম, তারপর কোন্ দিন, হয়ত একটা গরিবের মেয়ে, নয় ত একটা ব্রাহ্ম কিংবা বিধবা বিয়ে ক'রে আন্‌বে। সেই জন্যেই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বিলেত পাঠাব মনে কর্চ্ছি।

ঘট। বেশ ত, ঐ মিত্তিরদের মেয়েটী ত খুব সুন্দরী! আর বনেদী বড় ঘরের মেয়ে। তা হলে ঐখানেই ঠিক্ ক'রে ফেলুন্ না? কি বলেন্?

নন্দ। ( চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা, তা'দের আগে ছেলে দেখে যেতে বোলো, তারপরে যা হয় করা যাবে।

ঘট। আজ্ঞে, তাঁরা বলেছেন, ছেলে তাঁরা দেখ্‌বেন্ না। ছেলে ক'নের ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, ছেলে তাঁদের দেখা আছে। তাঁরা আরও ব'লেছেন, আপনার যদি মত হয়, তা হ'লে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে ফেলে বিয়ের দিন স্থির কর্বেন্।

নন্দ। দেনা-পাওনা মেটামিটি আর কি? আমি ত বলেই দিয়েছি, নগদ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। এর কমে আমি পার্ব্বো না।

ঘট। মশাই, সে কথা আমি বলেছিলুম্, কিন্তু তাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ করে কিছু কম জম করে নিন্! তাঁরা নগদ ছ' হাজার টাকা দেবেন্। অনেক মিনতি ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ ক'রে এইতেই রাজি হয়ে মেয়েটীকে নেবেন্। আপনার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের বড়ই ঝোঁক্ পড়েছে।

নন্দ। হুঁঃ,—আমার রূপ দেখে ঝোঁক্ পড়েছে; না, আমার ছেলের গুণে ঝোঁক্ পড়েছে? অনারে বি, এ, পাশ করেছে, বছর বছর মেডিকেল কলেজে পাশ ক'রে মেডেল পাচ্ছে। আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে! দশ হাজার টাকা ত' আমি খুব কম ক'রে বলেছি; বিশ হাজার টাকা বল্লেও অন্যায় হ'ত না। দশ হাজার টাকা দিয়ে যে এমন জামাই পাবে, তার ভাগ্যি ভাল। হুঁঃ—!

ঘট। (স্বগত) ছেলের বিয়ে দেওয়া নয়, যেন গরু-ছাগল বেচ্‌তে ব'সেছেন! আমাদের যে দু'পয়সা রোজগারের আশা ছিল, তা এই ব্যাটাদের কশা-মাজাতেই সব যেতে বসেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, সেখানে তা হ'লে হবে না?

নন্দ। যাও, তুমি তাদের বল গে, আমার যে কথা, সেই কাজ! নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে ত হবে, নইলে তাদের অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ্‌তে ব'ল। বিশেষ আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে হবে, তাতে কত খরচ হবে, তার ঠিক্ রেখেছ?

ঘট। যে আজ্ঞে! আর একটী মেয়ে আছে, সেখানে বেশ পাওনা-থোওনা হ'তে পারে।

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) কোথা? কোথা?

ঘট। আজ্ঞে, ঐ বি, এন্ মজুমদারের মেয়ে। তাঁর সবে ঐ একটী মেয়ে। ছেলে তাঁর পছন্দ হ'লে, যা চাইবেন্, তিনি তাই দেবেন্। এমন কি তিনি ছেলের বিলেত যাবার খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত আছেন্।

নন্দ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) তবে সেখানে এতদিন কথা পাড় নি কেন?

ঘট। আপনার মেয়ে পছন্দ হবে কি না হবে, সেইজন্যে কথা পাড়ি নি।

নন্দ। কেন, মেয়ে কি বড় কুৎসিত?

ঘট। আজ্ঞে না, মেয়ে কুৎসিত নয়। নিখুঁত সুন্দরী না হ'লেও মেয়েটী দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কিনা, মেয়েটী একটু বড়। আপনি ছোট মেয়ে খুঁজ্‌ছেন, এ মেয়েটী বছর-ষোল হবে। জানেন্ ত, ব্যারিষ্টারের মেয়ে, বিলেত-ফেরত লোক, তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন্।

নন্দ। ওঃ, তা হোক্, তা হোক্! আজকালকার ছেলেরা ডাগর মেয়েই বেশী পছন্দ করে। আমার প্রফুল্লও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নয়। তুমি আজই সেখানে গিয়ে থপরটা নিও। বুঝ্‌লে? ভুল না!

ঘট। আচ্ছা, আমি আজই যাব। কাল আপনি নিশ্চয় সংবাদ পাবেন্।

নন্দ। (স্বগত) কি জানি, এমন সম্বন্ধটা যদি দেরি হ'লে ফস্কে যায়! শীগ্‌গির

একটা ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেলেই ভাল হয়। (প্রকাশ্যে) কেন আজ্‌কে খপরটা দিয়ে যেতে পার্ব্বে না?

ঘট। আচ্ছা, চেষ্টা ক'র্ব্ব। এখন তবে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

[ অপর দিক্ হইতে বিজয় এবং সুকুমারীর প্রবেশ ]

সুকু। এলাহাবাদ থেকে কবে এলে?

বিজ। কাল রাত্রের ট্রেণে এসে পৌঁছেছি, মাসীমা! আপনারা সব ভাল আছেন্?

সুকু। হ্যাঁ বাবা! তুমি ভাল আছ?

বিজ। হ্যাঁ, সেখানকার জল-হাওয়া বেশ ভাল, শরীর বেশ থাকে।

সুকু। একেবারে দেশ-ছাড়া হ'য়ে পড়্‌লে বাছা! দেখা পাওয়া দায় হ'ল। প্রফুল্ল আর তুমি ছেলেবেলায় দু'টীতে দিনরাত্ একসঙ্গে পড়্‌তে, একসঙ্গে বেড়াতে, যেন দু'টী মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন! তুমি চ'লে গিয়ে প্রফুল্লর বড় কষ্ট হ'য়েছে।

বিজ। আমারও আপনাদের জন্যে ভারি মন কেমন করে। এক এক সময় এমন হয় মাসী-মা, কি আর বোল্‌বো? বড় কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু ক'র্ব্ব কি? এই ত সংসারের দশা! পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়। আজকাল উকিলদের এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে যে, কোর্টে বসে কাঁদ্‌তে হয়। দূরদেশে গিয়ে পড়্‌লে যদি দু'পয়সা পাওয়া যায়, এই আশা!

সুকু। পাচ্ছ কিছু?

বিজ। এই ত সবে গিয়েছি। এখন আর কি পাব? তবে পুরোণো উকিলরা বল্‌ছেন, কিছুদিন থাক্‌লে কিছু হ'তে পারে।

সুকু। পশার হ'লে মাকে বৌকেও নিয়ে যাবে না কি?

বিজ। (হাসিয়া) আগে পশারই হোক্।

সুকু। হ্যাঁ বিজয়! শুন্‌লুম তোমার শাশুড়ী ষষ্ঠীর তত্ত্ব ভাল ক'রে করে নি ব'লে তোমার মা না-কি তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন্?

বিজ। হ্যাঁ। মা কি কাজটা ভাল ক'রেছেন?

সুকু। তা, বাছা, প্রথম তত্ত্ব একটু ভাল ক'রে কর্ত্তে হয় ব্যই কি!

বিজ। সে কোথায় পাবে? সে দুঃখিনী বিধবা! তা'র কি সাধ যায় না, তার মেয়ে-জামাইকে ভাল জিনিষ দিতে? ক্ষমতায় না কুলুলে, দেবে কি ক'রে? যা দিয়েছিল, তা' অতি যত্নেই দিয়েছিল। যে ক'রে মা-কে চিঠি-খানা লিখেছিলেন্, তা' দেখ্‌লে পাষাণও গলে যায়, তবু আমার মায়ের প্রাণে দয়া হ'ল না।

সুকু। বড্ড শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌ছ, বাছা! তোমার মা তোমাকে কত কষ্টে মানুষ ক'র্লে, তোমার বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাবে কোথায়, তা' না হ'য়ে তা'রা ত এক পয়সাও দিলে না, আবার তত্ত্বও যদি একটা ভাল ক'রে না করে, তা হ'লে মায়ের মনে কষ্ট হয় না?

বিজ। ছি ছি, মাসীমা! আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্লেন না। শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌বার আমার কি দরকার? সে আমার কে? বরং মাকে ভাল মন্দ দু'টো কথা ব'ল্‌তে পারি, কেন না মা আমার। শাশুড়ী পর ব'লেই তাকে কোন কথা বল্‌তে পার্ব্ব না। আর আপনি যে বল্‌ছেন,

মা কত কষ্টে মানুষ ক'রেছেন! তা' আপনারা কি বল্‌তে চান্, লোকের বাপ্-মা মানুষ করে ছেলেকে মেয়ের বাপের কাছে বিক্রী কর্ব্বার জন্যে? বাপ্-মা ছেলেকে লালন-পালন ক'র্ব্বেন, লেখাপড়া শেখাবেন, এত ঈশ্বরের নিয়ম! বাপ্-মার কর্ত্তব্য বাপ্-মায় কর্ব্বেন্, ছেলের কর্ত্তব্য ছেলের ক'র্ব্বে। ছেলে উপযুক্ত হ'লে, কাজ-কর্ম্ম ক'রে হোক্, মোট ব'য়ে হোক্, উপার্জ্জন ক'রে বাপ্-মাকে এনে দেবে, প্রাণপণে বাপ্-মার সেবা ক'র্ব্বে। তা' না হয়ে, কি বিয়ে ক'রে লোককে উৎপীড়ন ক'রে কতকগুলো টাকা আদায় ক'লে ই ছেলের কর্ত্তব্য-পালন হয়? সেটা টাকা নয়, মাসীমা! মানুষের চোখের জল! গরম রক্ত! পরপীড়ন ক'রে টাকা নিলে তা'তে সুখ হয় না, সে অধর্ম্মের পয়সা ভোগে লাগে না।

সুবু। তোমরা বাছা, নতুন উকিল হ'য়েছ, তোমাদের বক্তৃতার কাছে আমরা কোথায় লাগ্‌ব? তবে যা চ'লে আস্‌ছে, তাই লোকে করে ও ক'চ্ছে।

বিজ। এই জন্যেই আমাদের দেশেরও এত দুর্গতি! আমাদের দেশের লোকের প্রাণে সমবেদনা নেই, কেউ কারও দুঃখে কাতর হয় না। একতা নেই, সাহানুভূতি নেই, কেবল যে যা'র স্বার্থ নিয়ে উন্মত্ত; তাই আজ আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট।

সুবু। এ তোমার অন্যায় কথা, বাছা!

বিজ। আমার অন্যায় নয় মাসীমা, আপনারা বোঝেন্ অন্যায়। মাকে যদি একটা কথা বোঝাতে যাই ত' মা উল্‌টে আমার উপর রাগ করেন্।

সুবু। (স্বগত) উনি যে বল্লেন্, মিছে নয়। এখনকার ছেলেগুলো হ'ল কি? লজ্জা-সরম একটু নেই, গুরুজনের কাছে একটু সমি নেই। (প্রকাশ্যে) তোমাদের সঙ্গে কথায় পার্ব্বো না। তোমাদের ছেলেপুলে হোক্, তখন দেখে নোব। এখন চল, একটু জলটল্ খাবে।

[ প্রফুল্লর প্রবেশ ]

প্রফু। কি হে কতক্ষণ?

বিজ। এই আস্‌ছি ভাই! তোমাদের দেখা-শুনো ক'র্ত্তে!

প্রফু। হ্যাঁ, দেখাশুনো ক'র্ত্তে আস্‌বে বৈ কি! এখন যে তুমি বিদেশী!

বিজ। কি করি ভাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়।

প্রফু। তোমার আস্‌বার কথা শুনে আমি সকালে বিছানা থেকে উঠেই তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম্, তুমি বাড়ী নেই। ভাবলুম্ দেখাটা হয় কি না সন্দেহ!

বিজ। অত ঠাট্টা কেন? তুমিও আগে কলেজ ছাড়, তারপর দেখা যাবে। সংসারের স্রোতে কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে!

প্রফু। এখন ভিতরে চল, তারপর তোমার লেক্‌চার শোনা যাবে।

[ সকলের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ

[ মণীন্দ্র ও প্যারিচাঁদের প্রবেশ। ]

প্যারি। হা—হা—মণি! ভারী মজা হ'য়েছে!—

মণি। কি হে, ব্যাপার কি?

প্যারি। অ্যাঁ, ব্যাপার? হা:—হা:—ব্যাপার বেশ চমৎকার!

মণি। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—ভারী মজা!

মণি। কি মজা তার নাম নেই?

প্যারি। সুন্দর! চমৎকার! হাঃ—

মণি। যাও, নাই বল, আমি চল্লুম।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

প্যারি। ( মণীন্দ্রের হাত ধরিয়া ) আরে ভায়া, যাও কোথা? সুখপর হে, সুখপর?

মণি। তোমার পেটের কথা পেটে রইল, তা সুখপর কি কুখপর আমি জান্‌ব কি করে?

প্যারি। হেম ঘোষ, হেম ঘোষ!

মণি। আঃ—কি বিপদ্! কি হ'য়েছে হেমঘোষের? স্পষ্ট ক'রেই বল না ছাই!

প্যারি। ভারী দুঃখের দশা হ'য়েছে! সে বাবুয়ানা-ভুঁড়ি নেই, সে বড়মানুষী পোষাক নেই, গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই; একটা মুটে-মজুরের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাবসা ফ্যাব্‌সার দফা একবারেই রফা! একদিন আমি বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম্।

মণি। হ্যাঁ, তোমাকে যে কথা বল্লুম, সে কাজের কি ক'র্লে?

প্যারি। কি কাজ?

মণি। (চুপি চুপি) তা'র সেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বার কথা?

প্যারি। ( হাসিয়া ) ওঃ!—তা'র জন্যে আর ভাবনা কি? সে মনে কর তোমার ঘরেই রয়েছে!

মণি। তাই না-কি?

প্যারি। আমি যে-কালে ব'লেছি ধ'রে এনে দোব, তা' যেমন ক'রে পারি এনে দোব। তা'র জন্যে তোমার কোন ভাব নেই।

মণি। হ্যাঁ, তা'কে ধ'রে আন্‌তে না পার্লে, আমার মনে শান্তি নেই। তা'কে ধরে আনতে পার্লে তবেই আমার অপমানের প্রতিশোধ হবে। তবেই হেমঘোষ জব্দ হবে।

প্যারি। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, দাদা! নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমাকে যে-কালে এ কাজের ভার দিয়েছ, তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমি তা'কে তোমার কাছে এনে দোবই, দোব!

মণি। ( সহাস্যে ) মেয়েটা যে ভাই, যেন স্বর্গের অপ্সরী! সে মেয়েটাকে পেলে আর আমি কিছুই চাই না।

প্যারি। চুপ্ চুপ্! কে আস্‌ছে না?

মণি। কৈ? [ দেখিয়া ] হ্যাঁ, ও যে হেম ঘোষেরই লোক না?

প্যারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ত বটে! ও বেটার যে দর্প! যেন কেউটে সাপ। মনিবের চেয়ে এককাটি সরেস!

[ সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ ]

প্যারি। [ অগ্রসর হইয়া ] কি হে ম্যানেজারবাবু! কুশল ত?

সর্ব্বে। ( স্বগত ) আঃ! এ আপদ আবার কোথা থেকে জুট্‌ল? [ প্রকাশ্যে ] ঈশ্বরের যেমন অভিরুচি!

প্যারি। মহাশয়, পদব্রজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মনিবের অত গাড়ী-ঘোড়া সর্ব্বদা চ'ড়ে বেড়াতেন্! আজ পদব্রজে কোথায় গমন হ'চ্ছে? ম'শায়ের চাকরি বাকরি গেছে না কি? মনিব তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? মুখ অত শুক্‌নো কেন?

সর্ব্বে। [ বিরক্তি-ভাবে ] আমি ম'শায়ের

এ অযাচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। [ স্বগত ] উঃ, মানুষ এত নীচও থাকে! আমাদের এখন সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে, তাই দেখে লোকের আমোদ হচ্ছে! এ-সব নরকের কীটকে ধিক্।

প্যারি। [ সপরিহাসে ] আমাদের কাছে কাজ কর্ব্বেন! [ মণীন্দ্রকে দেখাইয়া ] আমাদের এই বাবুর মতন সদাশয় লোক আর নেই। যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন। কাজও এমন কিছু ক'র্ত্তে হবে না; কেবল বাবুর বৈঠকখানায় ব'সে থাক্‌বেন, মজা ক'র্ব্বেন, খাঁটি খাবেন্। আর মেয়েমানুষ চান্, তাও পাবেন।

সর্ব্বে। ম'শায়! অনুগ্রহ ক'রে রাস্তা ছাড়ুন, আপনার সঙ্গে কথা কইবার এখন আমার সময় নেই।

[ প্রস্থান ]

প্যারি। দেখ্‌লে ব্যাটার তেজ দেখ্‌লে?

মণি। এ তেজ শীগ্‌গিরই যাবে।

প্যারি। ব্যাটা যা'র গুমোরে গুমোর করে বেড়াত, সে ত আজ একটা মুটে-মজুর বল্লেই হয়। ও-ব্যাটার তবুও অহঙ্কার ঘোচে নি!

মণীন্দ্র। এ অহঙ্কার বেশী দিন থাক্‌বে না। হেম ঘোষের মান-মর্য্যাদা সব যাবে,—সব যাবে, তার মাথা ধূলোয় লুটোবে, মণিরামের অভিশাপ বিফল হ'চ্ছে না।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

[ একদিক্ হইতে প্রফুল্ল ও অপর দিক্ হইতে সর্ব্বেশ্বরের পুনঃ-প্রবেশ ]

সর্ব্বে। এই যে প্রফুল্লবাবু! একবার আপনার সন্ধানেই যাচ্ছিলুম।

প্রফু। ( ব্যস্তভাবে ) কেন, কেন? সব ভাল ত?

সর্ব্বে। ভাল আর বল্‌ব কেমন ক'রে?

প্রফু। কেন কারু অসুখ করেছে না-কি? সুবোধ ভাল আছে? রমা ভাল আছে ত?

সর্ব্বে। শারীরিক এক রকম সকলেই ভাল আছেন, কিন্তু বাবুর মানসিক অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর! যেন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! নাওয়া খাওয়া ত নেই বল্লেই হয়, সহস্র ডাকে সাড়া দেন না। কখনও কখনও কথা ক'ন্ ঠিক্ পাগলের মতন! আমার বোধ হয়, তাঁর চিকিৎসা করা দরকার। তাই আপনার কাছে পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি।

প্রফু। আমি সামান্য লোক, কি পরামর্শ দোব? একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে দেখান্।

সর্ব্বে। এ সংসারে সব লক্ষ্মীর বরযাত্রী, প্রফুল্লবাবু! পয়সা না পেলে কেউ কথা কয় না! বাবুর অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সব গা-ঢাকা দিয়েছেন! বড় বড় লোক, যাঁরা বাবুর বৈঠকখানায় বস্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ত্তেন, তাঁরা আজ বাবুর নাম কর্লে চিন্তে পারেন না। অনেক লোককে দেখ্‌লুম, কেবল দেখ্‌ছি আপনিই তাঁর আগেকার মত বন্ধু আছেন। তাই আজ আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি; নইলে আসতুম্ না। সর্ব্বেশ্বর সে ধাতের লোক নয়।

প্রফু। [ সলজ্জভাবে ] আপনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য, আমাকে লজ্জা দেবেন না। কি ক'র্ত্তে হবে বলুন। আমাকে যা বল্‌বেন তাই ক'র্ব্ব।

সর্ব্বে। আপনি মেডিকেল কলেজের একজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র; চিকিৎসা- ও চিকিৎসক-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাও জন্মেছে। কোন্ ডাক্তারকে দেখান যাবে, আপনি বিবেচনা ক'রে বলুন্! আর,—আপনি সঙ্গে ক'রে আপনার কোন চেনা ডাক্তারকে নিয়ে গেলে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসাও ক'র্ব্বেন। বাবুর আর্থিক অবস্থা কি-রকম হ'য়েছে, তা ত আপনি জানেন্। এতবড় লোকটার এমন শোচনীয় অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় কষ্টদায়ক। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। আমি তাঁর বাপের আমল থেকে এই কাজ কচ্ছি। সব দেখেছি, সব জানি। কি ক'রে যে আবার তাঁর অবস্থা ফির্‌বে, আমি ভেবে কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

প্রফু। আপনিই সার্থক সংসারে এসেছিলেন। আপনার মতন মহৎ ব্যক্তি অতি-বিরল! আপনি চেষ্টা ক'র্লে, আপনি যত্ন ক'র্লে, নিশ্চয়ই তাঁর আবার উন্নতি হবে। যে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন, তার কি হ'ল?

সর্ব্বে। সেও ত গিয়েছে! একে অর্থের অনাটন, তা'তে বাবুর অমনোযোগ। মহাজনরা মাল ধারে দিতে চায় না। আমি একা আর কি ক'র্ব্ব?

প্রফু। দেখুন্, আপনাদের মতন লোককে পরামর্শ দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাঁকে এ-সময় কোন কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। মনের বিকার ওষুধে কি উপশম হবে? কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে, মানুষ যদি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, তা'হ'লে কাজেই তাঁর মনের বিকৃতি ঘটে। হয় পাগল হয়, নয় বিপথে যায়।

সর্ব্বে। সে কথা ত আমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু এখন কি কাজ আর আছে? কাজ-কর্ম্মে তাঁকে ব্যস্ত রাখ্‌ব কি করে! বিষয়-আশয় সব গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য গেল, আর কোন ব্যবসারও ত উপায় দেখ্‌ছি না। তবে আর তাঁকে কি কাজে ব্যস্ত রাখ্‌ব?

প্রফু। কাজের ভাবনা কি? মানুষের চোখের সাম্‌নে কত কাজ প'ড়ে রয়েছে, বেছে নেওয়াই শক্ত! আমার বিবেচনায় তাঁর এখন কোনও চাকরি ক'র্লে ভাল হয়। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, ব্যবসা চল্‌বে না; সুতরাং, এমন অবস্থায় চাকরি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ত দেখ্‌তে পাই না। তিনি এখন যদি কোনখানে চাকরি করেন, অর্থোপার্জ্জনও হয়, মনও ভাল থাকে।

সর্ব্বে। আপনি বেশ বলেছেন! আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তিনি কি বলেন!

প্রফু। যদি তিনি চাকরি ক'র্ত্তে স্বীকার করেন, তা হ'লে আমি তাঁর জন্যে কাজের চেষ্টা ক'র্ত্তে পারি।

সর্ব্বে। এখন তাঁর মত হ'লে হয়!

প্রফু। আচ্ছা, আমিও তাঁকে বল্‌ব। তবে এখন আসি। নমস্কার।

সর্ব্বে। নমস্কার।

[ প্রস্থান ]

( ক্রমশঃ )

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

# বিয়োগ-বিলাপ।

( ৺ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণে )

দেব!
সত্যই কি গেছ তুমি,
আঁধারিয়া মাতৃ-ভূমি,—
ডুবেছে গঙ্গার জলে দরিদ্রের ধন ?—
মা'র বুকে হানি ছুরি,
সত্যই করেছে চুরি
লুকা'ন মাণিক তার, কৌস্তুভ রতন ?

দেব!
সত্যই কি অমানিশা
অন্ধ করি দশ দিশা,
বঙ্গের আঁখির আলো দিয়াছে নিভিয়ে ?—
কি শুনিনু এ কু-রব,
দিগন্ত আকুল সব,
পুণ্যব্রত ঋষিবর, গিয়াছ চলিয়ে ?

দেব!
এযে চন্দ্র-সূর্য্য-পাত,
দেশ-যোড়া বজ্রাঘাত,
পিতৃহীন বন্ধুহীন দেশবাসিগণ,
এ যে শোক সীমাশূন্য,
হৃদিপিণ্ড শতচূর্ণ!
তুমি নাই—নাই সেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ?

দেব!
জননীর চির-ভক্ত,
জন্ম-ভূমি-অনুরক্ত,
অক্রোধ, অজাত-শত্রু, উদার, সরল,
ধর্ম্মতে ধর্ম্মাত্মা ধীর,
আত্মজয়ী চিত্ত স্থির,
বিশুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ, নিষ্কাম, নির্ম্মল

দেব!
মুখে মধুমাখা হাসি,
সতত মধুর-ভাষী,
মধুর স্বভাবে তব বিশ্ব মধুময়,
তথাপি তেজস্বী বীর
বরণীয় পৃথিবীর,
নির্ভীক শূরেন্দ্র তবু ক্ষমা স্নেহময়!

দেব!
"কঠোর বজ্রের তুল্য
কোমল-কুসুম-ফুল্ল",
সার্থক সে মহা-বাক্য তোমাতে ধরা।
হেন পুত্র তপোনিষ্ঠ—
—জানি না কি শুভাদৃষ্ট—
লভিলা এ বঙ্গভূমি কত তপস্যায়!

দেব!
স্বর্ণপ্রসূ—রত্নখনি,
মাতৃদেবী সোণামণি,
তাঁরি পুণ্যে বিধি তোমা পাঠালে ধরতে
আলোকে হইল রাঙ্গা,
গৃহ "নারিকেল ডাঙ্গা",
সেই আলো উজলিল সমস্ত ভারতে

দেব!
বাঙ্গালী হইল ধন্য,
বাঙ্গালা কৃতার্থমন্য,
অকলঙ্ক শশধরে ললাটে ধরিয়া!
কিন্তু হায়! কয় দিন
রাজভোগ ভুঞ্জে দীন,
পোড়া ভালে এত সুখ স'বে কি কাহার!

দেব!
দেশের গৌরব-সূর্য্য,
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পূজ্য,
সত্যই গিয়েছ চলি ছাড়িয়া ভূতল?—
সত্য তবে সর্ব্বনাশ,
আমাদের "গুরুদাস"
চলি গেছে!—ফুরায়েছে পরিচয়-স্থল!

দেব!
তাই হাহাকার করি,
সপ্ত কোটি কণ্ঠ ভরি,
চতুর্দ্দশ কোটি নেত্রে বহে অশ্রুধারা!
আজি মোরা বড় দীন,
আজি মোরা "ভাগ্যহীন,"
সকলেই স্নেহময়-গুরু-পিতৃহারা!

দেব!
পুণ্যযোগ ভূমণ্ডলে,
পুণ্যদা-জাহ্নবী-কোলে,
তুমি গেলে স্বর্গধাম অমর-সদনে!
আমরা স্মরিয়া হরি,
সশ্রদ্ধ তর্পণ করি,
লহ এই তিলাঞ্জলি স্নেহ-সিক্ত মনে!

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

---

# অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আক্কেল গুড়ুম!

বর-কন্যা বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতে হরনাথবাবু দৌড়াইয়া গিয়া সর্ব্বাগ্রে হরমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরু! সব টাকা পেয়েছ? গহনা পেয়েছ? বুঝে নিয়েছ?"

হরু ম্লানমুখে বলিল, "না!"

হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ কপালে করাঘাত করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমাকে একেবারে দহে মজা'ল! আমাকে ঠকাল! অমন জমিদার হয়ে ঠকাল!"

বরের মাতা গৃহিণী-ঠাকুরাণী দ্রুতপদে আসিয়া নববধূর মুখচন্দ্রমা দেখিবার অভিলাষে তাহার মুখাবরণ অপসারিত করিলেন। কিন্তু তাহা উন্মোচন করিয়াই, নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া অন্যদিকে মুখখানি ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার রাজীব-লোচনদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গণ্ডোপরি প্রবাহিত হইল। পুত্রবধূর নিকট তিনি আর অবস্থান করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে গো?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "কি হবে গো আর! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার কপাল পুড়েছে!"

সকলে পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে, এমন সুন্দর! যেন কার্ত্তিক! আর তার জন্যে কি-না একটা ঘোর কাল লালিত্যহীন লক্ষ্মীশ্রীহীন জলার পেত্নীকে ঘরে তার বৌ করে আন্‌লে?

কি আশ্চর্য্য বাবা! টাকার লোভটাই হ'লো বেশী! একটা পছন্দ, অপছন্দ নেই। হায় হায় হায়!!"

কর্ত্তা হরনাথ, তখন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি? বৌ ভাল নয়? আমি নিজে চোখে দেখে পছন্দ করে এসেছি, ভাল নয়? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" হঠাৎ কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "সে কি নয়! অ্যাঁ-অ্যাঁ!" দৌড়িয়া আসিয়া তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "ওগো বৌয়ের মুখটী খোলো ত দেখি?" কুটুম্ব-বাটীর পরিচারিকা বধূর মুখের কাপড়টি তুলিলে, কর্ত্তা দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন ও আবার কপালে করাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "হায় রে, বৌয়েতেও ঠকা'ল! সর্ব্বদিকে আমার ক্ষতি কর্‌ল। আমাকে আশায় বঞ্চিত কর্‌ল! এ মেয়ে ত নয়, আমি যে দোসরা মেয়ে দেখেছিলাম। সে যে ভাল! এ কে?" তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে, তোমার নাম কি গা?" কুটুম্ববাটীর ঝি বলিল, "কমলা।" বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঝি উত্তর দিল—'মথুর মিত্তির।'

কর্ত্তা বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! মথুর মিত্তির! ও সর্ব্বনাশ! আমার ভান গালে কি চড় মেরেছে! এত সে ডালিম-কুমারী নয়! এ ত জমিদার হরিদাসবাবুর কন্যা নয়! এ যে অপর লোকের কন্যা! কি—জুয়াচুরি! কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!"

সকলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "এখন উপায় আর কিছুই নেই। এখন বৌটীকে তুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান্। আহা ছেলেমানুষ, অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে!"

কে লইয়া আসিবে! গৃহিণী আসিলেন না। পল্লীর অপর স্ত্রীলোকগণ আসিয়া বধূকে হরনাথবাবুর বাটীর ভিতর তুলিয়া লইয়া গেল। সকলের পরস্পর কহিতে লাগিল, "যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি হয়েছে! বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! অনেকে হরনাথবাবুকে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার আর উপায় নেই। হরিদাসবাবু একজন প্রতাপশালী জমিদার! তাঁর সঙ্গে পেরে উঠা দায়।" (সমাপ্ত)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

---

# আবার।

আবার পরাণে কেন বাসনা জাগাও!
আবার আবার কেন
মুগ্ধ কর মোরে হেন,
আবার, আবার কেন ভ্রান্তেরে ভুলাও?
দেখাইয়া প্রলোভন
কেন আর টান মন,
নারায়ণ, দীনে আর কেন তাপ দাও?
ভুলাও আমারে হরি সকল ভুলাও!

উন্মাদ দুরাশা জাগে আকুল নয়নে!
যা কভু হ'বার নয়
কেন তাহা মনে হয়?—
হবে না, হবে না,—যাহা আর এ জীবনে!
দেখায়ে স্বরগ-চিত্রে
কেন দুঃখ দাও চিত্তে—
আর কেন দাও তাপ মৃত্যু-হত প্রাণে,
কেন ভাঙ ভাঙা বুক নিষ্ঠুর পীড়নে!

হবে না, হবে না আর,—ও কি কভু হয়?
ঐ মনোহর ছবি
ঢাক নাথ ঢাক সবি—
দেখায়ো না, দেখিব না,—ও আমার নয়!
বিচিত্র বরণে আঁকা
ঐ চিত্র থাক্ ঢাকা—
আঁধারে; ঘুমাও হৃদে দুষ্ট আশাচয়!
আর নয়, আর নয়,—ও হ'বার নয়!

জেগো না বাসনা আর, ঘুমাও ঘুমাও!—
জাগিলেই সেই জ্বালা,
বিষাক্ত যাতনা ঢালা!—
ওহো না—এ জন্ম মত যাও নিদ্রা যাও!
হায় আশা কুহকিনী
কেন দেখা দাও তুমি,
কেন বুক্ ভেঙ্গে চুরে পরাণ পোড়াও!—
ভেঙ্গেছে স্বপন,—তুমি স্বপনে মিলাও!

জেগো না দারুণ তৃষা, নাই হেথা বারি!
রসনা টেন না তুমি,
এ যে ঘোর মরুভূমি;
আসিও না অবসাদ, যাও দূরে সরি!
চল অবসন্ন হিয়া,
পায়ে দলি মোহ মায়া,
অতীত জীবন-স্মৃতি, যাও চিত ছাড়ি—;
আর কেন হত আমি, জ্বল বিশ্ব জুড়ি!

কুহকিনী লো কল্পনে, ধন্যবাদ তোরে,
এতটুকু ছুতা পেলে
সেই দণ্ডে উঠ জ্বলে!
বাসনার বিষলতা, চিত্ততরু বেড়ে
তর্ তর্ বাড়ি উঠে,
শত শত ফুল ফোটে,
নিমেষেতে এ জগৎ নবমূর্ত্তি ধরে!—
অপরূপ ইন্দ্রজাল!—পরাণ শিহরে!—

সহসা হেরিলে ছায়া, ধরি বসে তারে
অসত্য বাস্তব ভাবে,
'হাঁ'-কে 'না' করিতে চাবে,
ছায়ারে করিবে মূর্ত্তি আপনার জোরে।
বেশ-ভূষা পরাইয়া
আনে সত্য সাজাইয়া;
জাগাইয়া উন্মাদনা, উদ্ভ্রান্ত বিকারে
বিহ্বল করিয়া তোলে দৃঢ় মানসেরে!

তারপরে অকস্মাৎ সব মিশে যায়!
উজ্জ্বল সুন্দর বিশ্ব
হয় গো বীভৎস দৃশ্য
দৃষ্টিমাত্রে সুখ-সৃষ্টি সহসা ফুরায়!
তখন হৃদয় ভাঙ্গে,
শত বজ্র বুকে হানে,
থেমে যায় গীতি-তান, উঠে হায় হায়!
হতাশা হৃদয়ে জ্বলে, বাড়বাগ্নি প্রায়!

হে নরাশা, এ হৃদয়ও হইয়াছে ছাই,
তবে কেন পথ ভুলে
আবার কাঁদাতে এলে?
আর কেন? আর কেন!—আর কিছু না;
দেখায়ে দুর্লভ ধন
কেন লুব্ধ কর মন?
শ্রান্ত মম ক্ষুদ্র চিত্ত,—যা দেখি তা চাই;—
ক্ষিপ্ত অসন্তোষে সদা জ্বলে মরি তাই!

এ হৃদেও সব ছিল, ছিল না আঁধার,
একদিন সব ছিল,
ছিল পূর্ণিমার আলো,—
বহিত মলয়, হ'ত পাপিয়া-ঝঙ্কার—
বসন্তের চারু প্রভা
ফুল্ল-পুষ্প-বীথি-শোভা
পুষ্পগন্ধ-ধ্বনি, সব সৌন্দর্য্য সম্ভার!
একদিন ছিল সব,—কিন্তু নাই আর!

সরি গেছে এবে পৃথ্বী পদতল হতে—
ডুবে গেছে রবি শশী,
ভেঙ্গেছে সাধের বাঁশি,
উড়ে গেছে আশা-পাখী অনন্ত শূন্যেতে?
সে শুধু গো মরীচিকা,
আয় আয় কুজ্ঝটিকা,
ঢেকে ফেল চরাচর, পারি নে দেখিতে!
সহে না, সহেনা আলো আর এ আঁখিতে!

মিশি যাও নীলিমার কামনা কল্পনা,
হবে না হবে না আর,
শূন্যে গৃহ গড়া সার!
কিছু নয়, কিছু নয়, মায়ার ছলনা!
হে মানস, ভুলি যাও,
সব দূরে ঠেলি দাও,
নব-আশা, আর তুমি কাঁদাতে এস না!
ফুটে ফুল ঝরে গেছে, আর ফুটিবে না!

সুখ ত গিয়েছে চলে, হে অতীত স্মৃতি,
কেন ক্লেশ দাও মোরে,—
খড়্গাঘাত মৃত 'পরে,—
ক্ষমা কর মোরে, আমি হতভাগ্য অতি!
যাও যাও যাও সরে,
জ্বালায়ো না আর মোরে;
জাগিয়া হৃদয় মাঝে কর বড় ক্ষতি!—
এবার ঘুমাও, দাও অনন্ত নিষ্কৃতি!

মগ্ন হও দীপ্ত-স্মৃতি, বিস্মৃতি-সাগরে,
অন্ধে জাগরণ কিবা?—
সম সব, রাত্রি-দিবা!
আমারেও দাও, নাথ, দাও তাই করে!
এখনো কামনা করি,
দাও দাও দাও হরি,—
অসীম অটুট ধৈর্য্য দাও এ অন্তরে,
ছিঁড়ে নাও চিত্তবৃত্তি টানিয়া সজোরে!

আমার কি? আমি কে বা? কি হবে আমার?
কিছু নয় কিছু নয়,
মনে শুধু ভুল হয়,
মন-মাঝে মিথ্যা সাজে সাজান সংসার!—
বাসনা, আসক্তি, লোভ,
ঘুচাও বেদনা, ক্ষোভ
ভুলাও, ভাঙ্গিয়া দাও—জগদ্-ব্যাপার!
ভুলাও—ভুলিতে দাও, যন্ত্রণা এবার!

নাও নাও নাও হরি, মম কর্ম্মফল—
ক্রোধ হিংসা অভিমান,
নাও ব্যথা অপমান,
নাও নাও ভগবান্ অন্তর গরল!—
গোপিনী-বসন-হারী—
নাও মম চিত্ত কাড়ি,
হর হরি, হর-হরি—কুহক সকল!—
নাও প্রাণে শান্তি, হৃদে ভক্তি, মুখে বল!

ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব সব লহ নারায়ণ!
মম কায়-মনো-বাণী
সঁপিনু তোমারে স্বামী,
হে কর্ম্মী, করাও কর্ম্ম,—যা তব মনন!—
বুদ্ধি-বৃত্তি-শক্তি-স্মৃতি
লহ নাথ, মতি গতি—
করিনু চরণমূলে আত্মসমর্পণ—!
যোগ্য কর তব কাজে,—দীনের জীবন!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

# পালামৌ-ভ্রমণ।

পালামৌ-জেলার অধিকাংশ স্থান নিবিড় জঙ্গল এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহা পূর্ব্বে রাঁচির একটী সবডিভিসন ছিল, কিন্তু এক্ষণে জেলায় পরিণত হইয়াছে। এই জেলার সিবিল ষ্টেসন ডালটনগঞ্জ। পালামৌর দক্ষিণে রাঁচি, উত্তরে গয়া, পূর্ব্বে হাজারীবাগ, পশ্চিমে মির্জ্জাপুর এবং আরা জেলার কতক অংশ। এ জেলায় সমতল পথ একটিও নাই বলিলেই চলে। কারণ, ডালটনগঞ্জ হইতে রাঁচির রাস্তা যদিও প্রশস্ত, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে সমাকীর্ণ। বেগে শকট-চালনা করা অতিশয় বিপজ্জনক। এখানে ছোট ছোট গিরিনদীগুলিতে পুল নাই। দুই এক ঘণ্টা বৃষ্টি হইলেই "বাণ আসে" এবং তখন কিছুতেই পার হওয়া যায় না। আরও দুই চারিটি গাড়ী চলিবার পথ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা অশ্বারোহণেই পরিদর্শন-কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায় সকলকেই অশ্ব ধীরে ধীরে চালাইতে হয়। দৌড়াইবার পথ নাই।

পালামৌ-নাম শুনিলেই মনে হয়, ইহার সঙ্গে "পলাণ্ডক"-কথার কিছু সংস্রব আছে। পালামৌ-দুর্গ দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, বহু পূর্ব্বে রাজপুতানার কোন ক্ষত্রিয় রাজা পালাইয়া আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। পালামৌ দুর্গের গঠন এবং আগ্রার দুর্গের গঠন একই প্রকার। এ স্থানে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সেগুলি দেখিলেও উক্ত জনরবের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়।

পালামৌ দুর্গ ডালটনগঞ্জ হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরে। এখন উহা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি। মার্চ্চ মাস অতীত না হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল এবং ঘাসের জন্য তথায় যাওয়া যায় না। গ্রীষ্মারম্ভে জঙ্গল শুষ্ক হইলে, কোন প্রকারে তথায় যাইতে পারা যায়; কিন্তু বন্দুক এবং সঙ্গে দুই চারিজন লোক না লইয়া যাওয়া নিরাপদ্ নহে। দুর্গ দুইটি। একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। উভয় দুর্গই আংশিক রূপে পাহাড়ের গায়ে। বর্ত্তমান কালে দুর্জ্জয় না হইলেও, পূর্ব্বে ইহা দুর্জ্জয়ই ছিল।

এখন রাজবংশের আর কেহই নাই।

তজ্জন্য সমস্ত রাজ্যটি গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল হইয়াছে। পালামৌতে জনরব নির্ব্বংশের বিষয় লইলে নির্ব্বংশ হইতে হয়, এই ভয়ে নিকট-জ্ঞাতির মধ্যে কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। নোয়া জয়পুরের রাজবাহাদুর পালামৌ-রাজার জ্ঞাতি বলিয়া খ্যাত। রাজবাটীতে যাহারা ছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগে তাহাদেরও অস্তিত্ব গিয়াছে; এবং ক্রমে কেল্লাও ধ্বংসাবশে পরিণত হইয়াছে। শেষে কালের ভীষণ চক্রে এখন উহা বন্য জন্তুর লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কেল্লার মধ্যে রাজার অন্তঃপুর, কাছারি এবং অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলির কতক অংশ ইষ্টক এবং প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, কতক অংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে। ঘরগুলি ছোট ছোট ও অনুচ্চ। দুর্গ-প্রাচীরের বাহির হইতে ভিতর বনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরে বেশ পরিষ্কার। এক একটি দুর্গে ১০।১৫ হাজার সৈন্য অনায়াসে বাস করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে রাজবাটীর সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান এবং চতুর্দ্দিক্ যে অতিমনোরম ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জঙ্গল এবং ব্যাঘ্রভীতিতে সকল স্থানে যাওয়া যায় না। যাঁহারা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ঐ সকল স্থান দেখিতে যান, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই সহজে দুর্গে প্রবেশ করে না। সুতরাং, বন্য জন্তুরা অনায়াসে তথায় বিচরণ করে। আমরা দেখিলাম, স্থানে স্থানে কত ময়ূর পেখম ধরিয়া রহিয়াছে, কত স্থানে হরিণের পাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কত শত জন্তু বিশ্বস্ত-হৃদয়ে শব্দ করিতেছে, কত চীৎকার করিতেছে! আমরা মধ্যাহ্নে তথায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রাণভয়ে দ্রুত-গতিতে চলিয়া, দুই তিন মাইল দূরে লোকালয়ে পঁহুছিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

---

# ভক্তিকৃপা।

এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, আমাদিগের হৃদয় কখন কেমন সরস থাকে, ঈশ্বর-পূজার কেমন অনুকূল হয়, ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য তথায় কেমন গভীর ব্যাকুলতা বিরাজ করে; আবার কখনও বা শত সহস্র চেষ্টাতেও সেই হৃদয়কেই ঈশ্বরমুখীন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ভগবৎপূজার জন্য তাহাতে আদৌ স্পৃহা থাকে না, ব্যাকুলতা থাকে না। অনেক সময় আমাদিগের এই শোচনীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া আমরা মুহ্যমান হই এবং পরস্পর বা আপনা আপনিই জিজ্ঞাসা করি, "হরিতে আমার ভক্তি নাই কেন? ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয় না কেন? এবং ইচ্ছা হইলেই বা তাঁহার নাম করিতে পারি না কেন? কি হইলে, কি করিলে, ভগবানে ভক্তি হয়, সর্ব্বদা হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত থাকে?" জগতে এইরূপ অবস্থা আমরা অহর্নিশ আমাদিগের মধ্যে এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ নরনারীদিগের মধ্যে অবলোকন করিতেছি। এই অবস্থা-বিপর্য্যের

হেতু যে কি, তাহা হৃদয়-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যতই আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করি, আমা হইতে প্রসূত ক্রিয়াকলাপ যতই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে থাকি, ততই ইহার কারণ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। সে কারণটী অতিসামান্য—"আমি যাহা চাহি না, তাহা পাই না। যাহা চাহি, তাহাকে লইয়াই বসিয়া থাকি। আমার ঐ ভক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিকমাত্র, ঐ ইচ্ছা মৌখিক ইচ্ছামাত্র, উহার মধ্যে যথার্থ্যের অভাব, উহার মধ্যে প্রাণের অভাব। ঐ ইচ্ছা আমার নিজকৃত নয়; উহা অপর এক শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে করিতে আমরা আপনা ভুলিয়া সংসারের কীট হইয়া যাই, আপনার জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। পরমপ্রেমময় সর্ব্বব্যাপী হৃদয়বিহারী হরি আমাদিগের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া, আমাদিগকে পথভ্রান্ত হইয়া উৎপথে ধাবিত দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চেতনা-সম্পাদন করেন, আমাদিগকে জাগরিত করিয়া দেন্ এবং তখনই আমরা আমাদিগের চিত্তকে সরস দেখি, ভক্তিপ্রবণ দেখি। এ ভক্তি সেই প্রেমময়ের কৃপা।

ভগবানের এই ভক্তিরূপ কৃপা লাভের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে গভীর অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, দীনভাবে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, আলস্য-পরিহার-পূর্ব্বক ইহার সহিত সাধনা করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না এই কৃপা অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

যখন হৃদয়মধ্যে ভক্তির অল্পতা বা অভাব অনুভূত হইবে, তখন আপনাকে বিশেষভাবে দীন হীন দরিদ্র মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আপনাকে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা শোকে মুহ্যমান হওয়াও বিধেয় নহে। লীলাময় পরমেশ্বর বহুদিন যাবৎ যাহা প্রদান করেন নাই, অনেক সময়, মুহূর্ত্তমাত্রে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন; ভক্তের প্রার্থনার প্রারম্ভে যে কৃপার স্রোত তিনি রুদ্ধ করিয়া রাখেন, প্রার্থনার অবসানে তাহাই উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রার্থনামাত্রই যদি ভগবৎ-কৃপা অবতীর্ণ হইত, ইচ্ছামাত্রই যদি ইহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্য এই কৃপা ধারণ করিতে পারিত না। তিনি পরম কৃপাময়, সেইজন্যই আমাদিগকে আহ্বান করিয়াই আমাদিগের আকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করেন, আমাদিগকে সবল করেন, তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত করেন। এই জন্যই, বোধ হয়, কবি গাহিয়াছেন—

"যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব,
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

দীনভাবে ধৈর্য্যের সহিত আশান্বিত হৃদয়ে ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করিতে হয়। তখন হৃদয় কবির সহিত বলিতে থাকে,—

"রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উষস-দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ, নব প্রাণ,
নব দিবা-আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে
কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে ;"

আপনাদিগের অন্তরের মধ্যে নিরন্তর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, এরূপ ক্ষুদ্র, এরূপ মলিন, এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহে আমরা আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ঘৃণার্হ বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা একবার চিন্তা করিলে স্বভাবতই আপনাদিগের প্রতি আপনাদিগের ধিক্কার আসে, এবং বুঝিতে পারি, এ হেন মলিন আসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আসিবে কিরূপে। যখন হৃদয়ে ভক্তি অনুভূত হয় না, অথবা গুপ্তভাবে ইহা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র আসক্তি, হৃদয়ের মলিনতাই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুই, যদি জগতে বাস্তবিকই কাহাকেও ক্ষুদ্র বলা যায়, অনেক সময়ে ঈশ্বরকৃপা-লাভে অন্তরায় হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্তরায় যদি দূরীভূত করিতে পারা যায়, এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার গণ্ডী অতিক্রম করা যায়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইব। কারণ, যে মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করি এবং মন যে বস্তুর অভিলাষ করে তাহার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া সম্যক্রূপে ঈশ্বরে স্থিত হই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হই এবং পরমা শান্তি উপভোগ করিতে থাকি। ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখ জগতে আর কিছুতেই নাই। হৃদয় যদি যথার্থভাবে বলিতে পারে, "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর সুখকর অবস্থা কোথায়! আমাদিগের দায়িত্ব কিছু নাই। 'হে ভগবন্, যে কার্য্যে তুমি নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি কে! তোমার ক্রিয়ার আমি উপলক্ষ মাত্র।" কি সুন্দর অবস্থা! ইহাই ত প্রকৃত অবস্থা।

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আপনার সমুদায় বাসনা পরমেশ্বরে অর্পণ করে, সৃষ্টি-রাজ্যের কোনও বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি বা ঘৃণা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ভগবৎ-কৃপার অধিকারী, ভগবদ্ভক্তি লাভের উপযুক্ত। ভগবান্ শূন্য হৃদয়েই তাঁহার আসন রচনা করেন্, শূন্য হৃদয়েই তাঁহার কৃপা বর্ষণ করেন্। যত সত্বর ও যে পরিমাণে মানব ক্ষুদ্র বস্তুর আসক্তি পরিহার করিতে পারে, যে পরিমাণে আপনার বাসনা বর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শীঘ্রতরই ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণেই উহা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণেই উহা বিমুক্ত হৃদয়কে উন্নত করে।

চিত্তে ভগবদ্ভক্তির সমাগম হইলে, সে চিত্ত আপনার সৌন্দর্য্যে আপনই বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আপনাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলে, অনন্ত প্রেমময়ে আপনাকে লীন দেখে। তাহার দৃষ্টিতে আর আত্মভাব থাকে না, সে দৃষ্টি প্রেমময়ের দৃষ্টি হয়, চিত্ত প্রসারিত হইয়া

এই বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে চায়, ভগবান্ যে আপনাকেই তাহাকে দান করেন। ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করিলে আর কি চিত্ত ক্ষুদ্র থাকিতে পারে! তাহা যে তখন শুদ্ধ মহান্ আনন্দে বিলীন হইয়া যায়!

---

# দেবীর স্থান।

পল্লীবাসী দ্বিজ এক মহাপ্রাণ, নাম সনাতন,
বৃথা-বাক্য-আন্দোলন ব্যসনেতে অনাসক্ত-মন ;
আপনার মত পরে প্রেম-ব্রতে ঢালি দিয়া প্রাণ,
মর্ত্ত্যের মাঝারে রহি' পেয়েছিল স্বর্গের সন্ধান।
গ্রামবাসী নিরক্ষর হীনমতি যুবকের দল
উপহাসি' বিপ্রস্থতে, উপেক্ষায় হাসি খলখল্,—
অবোধ পাগল বলি' তা'র পানে চাহিত না ফিরে,
দীন বিপ্র সে উপেক্ষা মানিয়া লইয়া নতশিরে ;—
দেবতার পানে চাহি বলেছিল হইয়া কাতর,
'হে প্রভু জগতে যারা পাপকর্ম্মে নাহি করে ভয়,
অবোধ অভাগা তা'রা, নাহি জানে তোমার সন্ধান,
দয়া করি দীননাথ, তাহাদের ক'র পরিত্রাণ।'

সেই সব পাষণ্ডেরা, একদিন দিবা দ্বিপ্রহর,
স্নানান্তে ফিরিতেছিল নদীতীর করিয়া মুখর ;
সহসা হেরিল এক ছাগশিশু নয়ন-রঞ্জন
তৃষিত হইয়া বারি পান করে হ'য়ে একমন ;
হেরি উপজিল লোভ কচিমাংস ভক্ষণের তরে,
চুপি চুপি পিছে গিয়া চাপিয়া ধরিল বজ্রকরে।
করস্পর্শে চমকিয়া উঠে ছাগ আকুল চঞ্চলে,
প্রাণের ভিতর কাঁপি উঠিল কি যেন অমঙ্গলে!
আর্ত্ত গভীর দৃষ্টি, সকরুণ বেদনায় চাহি',
রহিল ব্যাকুল পশু ; যদিও রে মুখভাষা নাহি,
নয়নে ফুটেছে যাহা হৃদয়ের গুপ্তবাণী তা'র,
বুঝিবে কে তার অর্থ, খোলে কে সে রহস্য-দুয়ার!

অভাগা আঁখির ভাষা বুঝিল না পাষণ্ডের দল ;
রজ্জু দিয়া বাঁধে তা'রে। সারাদিন ফেলি' অশ্রুজল,
রহিল ব্যাকুল ছাগ বেদনায় উদ্বেল পরাণ ;—
মৌন-নির্ব্বাকের জ্বালা, কে করিবে তা'র পরিমাণ?

দুঃখিনী জননী তা'র আজি হায়, সারাদিন বুঝি,
বনে বনে পথে পথে হইয়াছে ক্লান্ত কত খুঁজি ;
ওই ক্ষুদ্র শিশু তা'র পুঁজি শুধু, বুক-জোড়া ধন!
পশু-জীবনেরো আছে স্নেহ প্রেম-আনন্দ-বেদন।

ভীম অট্টহাস্য ঘোষি' প্রকটিল দানব-দিবস
নিষ্ঠুর মাংসাশি-দল, নরত্বের ঘোষি' অপযশ!—
সেই ছাগশিশুটীরে লয়ে যায় গ্রামপ্রান্ত দেশে,
কালীর মন্দির-দ্বারে, উত্তরিল পূজারীর বেশে!
বাস্তকর-স্কন্ধোপরি বাজি ওঠে পটহের রোল,
সংস্কার-প্রবাহমত্ত নরনারী তোলে গণ্ডগোল।
ভীম নিষ্ঠুরতা ঘোষি' সে পশুত্ব-উৎসব ভিতর,
সনাতন-ধর্ম্মতনু কাঁপি' ওঠে থর্ থর্ থর্!

তখনো জাগিছে আশা ক্ষুদ্র-ছাগশিশু-কল্পনায়,
ফিরে যেতে পারে বুঝি, জননীর বক্ষের সীমায়।
সুখ-স্বপ্ন ভাঙি দিল হেনকালে ভীম আকর্ষণ,
করিল না কেহ তা'র বেদনায় নয়ন-বর্ষণ!
চিৎকারি উঠিল ছাগ মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণার সনে,
আর পাষণ্ডেরা হর্ষে নৃত্য করে মায়ের প্রাঙ্গণে!
সহসা নিমেষ-মাঝে সদ্যউষ্ণ শোণিত ধারায়,
রঞ্জিত হইল স্থান, বর্ব্বরতা-ভরা আজিনায়;—
হতভাগ্য ছাগশিশু স্কন্ধচ্যুত পড়িল বিকট,
কম্পিত সে দেহখানি পড়ি' পড়ি' করে ছট্‌ফট্!

হেন কালে সেই দীন মহাপ্রাণ দ্বিজ সনাতন,
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত উপনীত দেবীর-ভবন;
গিয়া দেখে প্রাঙ্গণেতে খণ্ড ছাগ পড়িয়া লুটায়,
আর পাষণ্ডেরা হাসি' নাচে হর্ষে পিশাচের প্রায়!

রহিল না ব্রাহ্মণের বুঝিবারে বাকী কিছু আর;
হেরি' সে করুণ দৃশ্য বেড়ে ওঠে অন্তরের ভার!
মন্দির বাহিরে এক স্নিগ্ধ শান্ত বটের ছায়ায়,
বসে গিয়া শোকাচ্ছন্ন, ঘোরদুঃখে বক্ষ ফাটি' যায়!
অন্তরে ফুটিয়া ওঠে বেদনার তীব্র অনুভূতি,
মর্ম্মতলে জ্বলি ওঠে যন্ত্রণার জ্বলন্ত আহুতি।
ছাগ-বধ খড়্গ যেন তারি বুকে বা দিয়াছে আসি,
মহান্ মানবধর্ম্ম সনাতন সত্যেরে বিনাশি'!

এ-দিকেতে সেই সব পশু-হন্তা যুবকের দল
লয়ে পশু ছাগশির মহাশব্দে করি' কোলাহল,
দেবীর সম্মুখে আসি' রাখি' দিল আনন্দ-উন্মাদ ;
বিশ্বের জননী হায়, কত আর সহে আর্ত্তনাদ
নিঃসহায় পশুদের ! নড়ি' ওঠে দেবী-সিংহাসন,
অঁড়মূর্ত্তি-হস্তে কাঁপি খসি' পড়ে কৃপাণ ভীষণ !

মানবের অত্যাচারে নিরাশ্রয় পশুর চিৎকার,—
করুণা গলিল বিশ্বে ; কাঁদি ওঠে বক্ষ দেবতার !
সহসা কালিকামূর্ত্তি থর থর দোলে কম্পমান,—
ওকি ! ওকি ! অকস্মাৎ, ফাটি' গেল মুরতি পাষাণ !
ভীম শব্দে দুই খণ্ডে দেবীমূর্ত্তি পড়ে বেদীতলে,
স্তম্ভিত চকিত ভীত রোমাঞ্চিত হেরিল সকলে !!

'হায় কি হইল' বলি' চাপি' হাতে ভীত-বক্ষভার,
পাষণ্ডেরা বেদীতলে লুটাইল করি' হাহাকার।
বলে, 'মাগো আমরা যে এত পূজি' দিনু বলিদান,
উন্মাদন অর্চ্চনায় এত যে মা ঢালিনু পরাণ ;
জননি গো, একি আজি সর্ব্বনাশ হ'ল পাপে কার,
কি প্রচণ্ড অপরাধে আজ দেবি, হেন অবিচার !

অকস্মাৎ বেদী হ'তে দৈববাণী ধ্বনিল ভীষণ—
"রে নির্ব্বোধ নরপশু, ঘৃণিত এ পূজা-আয়োজন,
এ নহে অর্চ্চনা মোর—এ উৎসব শুধু যন্ত্রণার !
নাহি যেথা দয়া-প্রেম, নহে সেথা প্রতিষ্ঠা আমার !
রে বর্ব্বর, তোরা দায়ী আজিকার পাপোৎসব তরে,
নাহি আর স্থান মোর প্রেমশূন্য এ মন্দির 'পরে।
দয়া, দয়া, কোথা দয়া ! ছোটে প্রাণ যেথা অশ্রুজল ;
সনাতন কাঁদে যথা, সেই মম আশ্রয় শীতল !"

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

# সংবাদ।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে :—

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। (২) ঠাকুরদাস-দত্ত সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব। (৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-সুবর্ণপদক—প্রাচীন

বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। (৪) রাম-গোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য-সমালোচনা। (৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব। (৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্য-পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। (৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ। (৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাবড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি সম্পাদকের নিকট জানাইবেন এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও তদ্বিবরণ সত্বর জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্যসামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র-দ্বারা আপন আপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

---

# ভগিনী-হীন।

জানি নি কেমন শোক,
ভগিনি আমার—ভগিনি আমার গো!
কোমল-কলিকা সন্তান-দু'টী
অবসাদ-ভরে পড়েছে যে লুঠি',
তুমি ত নিয়েছ জীবনের ছুটি,
পশেছ অমৃত-লোক!
সান্ত্বনা কি-বা দিয়া গেলে মোরে
কেমনে তাদের রাখি বুকে ধরে?
আকুল নয়ন খুঁজে নিশা-ভোরে,
মানে না কাহিনী-শ্লোক!

ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বার বার বল, মিছা কথা বলি'
নিশি দিন আর কত করে' ছলি?
'আসিবে জননী!!' শুনে কুতূহলী
'রাতিটা প্রভাত হোক্!'
বিশ্বাস আজ করে না'ক মুখে
গ্রাস ল'য়ে ফুলে' কেঁদে' ওঠে দুখে!
কেমনে তা'দের চেপে রাখি বুকে
শুকায়ে আপন চোখ?
ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বুঝেছি কেমন শোক!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 666. February, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।


## উননবতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট হাস্য দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক্;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক্, আমার খুলুক্, সকলের খুলুক্।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-ক্ষমায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পারেন্, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলিতে

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিকটা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিষ নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়।

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিব।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।"

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও শ্রান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দূর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুষ্কর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকামিনী রায়।

# আঁধার সাঁঝে।

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটি জ্বলে ?
গুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে !
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া ?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে !
কে গো আমার ভাঙা গানে
রাঙিয়ে দিল অগ্নি-বাণে ?
সন্ধ্যাসুধার মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে !
আঁধারে ঘা' ছোট ছিল,
আলোর মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে !
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
লুটায় চরণ-তলে গো—
লুটায় চরণ-তলে !

দরবেশ

---

# হিন্দুর তীর্থনিচয়।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে ষাটটী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। সুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি ( মহাদেব ) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইঁহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিক্স্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোলে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির্ নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইঁহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন্। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্ববৃক্ষের তলে অষ্টভুজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্মেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের যত আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে সহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশী-নগরী রহিবে', ততদিন আপনি উহার রক্ষার্থ দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া সেথায় থাকিবেন্।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্রগ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি-মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কুঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যাবাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (সাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী সুখোমুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইঁহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী মেজ আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র মেজ আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাসকাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাসকাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রস্থিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভুজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চকোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্দ্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসি-সঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠ-দিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারানসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

---

## গান—

সকল আশা জুড়িয়ে দেওয়া
আস্‌বে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত!

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ্,
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে দুলন্ত!

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না ক্ষুব্ধ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

---

# সেই পথে।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায়;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায়;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
বাহ্যতায় নাহি যায় ভুলে;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে!

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় চলে না'ক প্রাণ;
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান;
ভ্রম-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে;
সেই ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত-ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে!

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিবাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া;
তুচ্ছ তরে হিয়া যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায়;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ঋজুমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায়!

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে!
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে ক্ষণেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ভাবে মন জগৎ-পিতায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# আত্ম-বিসর্জ্জন।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

## তৃতীয় দৃশ্য।

[ হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে;
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ। ]

হেম। ( সুবোধকে দেখিয়া ) আহা! আমার ননীর পুতুল ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জ্বালায় বাছা আমার বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! ( কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন ) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছো সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে'! চিরদিন যদি এমি দুঃখে কষ্টে কাট্‌ত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম্, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে দীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, দীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জ্বালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তারা আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জ্বালায় চিৎকার ক'চ্ছে' না! ওঃ—কি ছিলুম্ কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম্, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাব্‌সা আরম্ভ কর্‌লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা; রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জ্বালা বরদাস্ত কচ্ছে, ছেঁড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি; তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

( হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল— )

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন্ কেন? আমার বড্ড

ভয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্। অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা?

( হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল ) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস।)

( অন্নপূর্ণার প্রবেশ। )

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন। ( হেমচন্দ্রের প্রতি ) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তা'দের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পারছ না?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে?

অন্ন। দুঃখ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ? সোণার পুতুল রমা শুকনো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—এ সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ, সুখ। এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্ব্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ ক'রে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক্, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্নপূর্ণা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য। অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো? পুরুষের দশ দশা! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস কর্‌তে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি! আমি আর কি বল্‌ব? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র!

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্‌তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ! তুমি একটা চাকুরি বাকুরি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাকুরি? চাকুরি আমি কি কো'র্ব্বো? চাকুরি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা! আর কেই বা আমাকে চাকুরি দেবে? 'চাকুরি দাও', 'চাকুরি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাকুরি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাকুরি খালিও আছে, চেষ্টা ক'র্লে তোমার জন্যে সে ভাল চাকুরি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্‌তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুন্‌বো। দেখ্‌ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি করে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্‌তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাকুরি ক'র্লে? আমাদের ত' কোন কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাকুরি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাকুরি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

প্রফু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেণ্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড্ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজটা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপনার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'র্লে সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কলে'ইত' বেশ হত! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি করে থাক্‌বে?

প্রভু। তা'তে কি মা! ম্যানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রভু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌ব। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

## চতুর্থ দৃশ্য।

( মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা। )

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।

লীলা। কখন্ শুন্‌লি?

পরি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠক্‌খানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাক্‌রি হ'য়েছে, সে কোন্ দেশে চাক্‌রি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে?

লীলা। তোর মিছে কথা! তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমার কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্যে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেকিচি?

লীলা। দেখিস্ নি, শুনেছিস্ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন ক'চি মেয়ের বে হয়?

লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্ করে জেনে আমাকে খপর দিস্ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে খপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[ প্রস্থান ]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমায় কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য।

( হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, সুবোধ, প্রফুল্ল, সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস। )

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সাশ্চর্য্যে) অ্যাঁ, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক্ ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার সুবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? ( হরিদাসের প্রতি ) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্‌লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন্, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি, —এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমকহারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপনি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপনাকে সত্য গোপন কচ্ছিলুম্ তা'র কারণ বল্লুম্, পাছে আপনি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপনার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্যে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাকতে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্যে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চককে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মাম্‌লা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,—তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না। বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোল্‌বার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্‌নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেষনে পাঠিয়ে দাও গে।

( ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন। )

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা!

( অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন )

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে-পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্‌বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্‌বো বাবা। তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাক্‌বেন্? আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা! আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্‌তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ,

জঙ্গলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার?

( সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল। )

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? কান্না কিসের? আমি আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব। ( স্বগতঃ ) একি মোহ? এদের কষ্টের জন্যেইত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে, তবে প্রাণ এমন করে কেন? এত ভাব্‌না হয় কেন? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোরো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস।

হেম। আস্‌ব। রমা, তবে যাই মা?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছ্‌ছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কর্চ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘট্‌বে। ( কাঁদিতে লাগিলেন )

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রফুল্ল! আমি চল্লুম, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রফু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

( সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল )

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। ( স্বগতঃ ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। ( প্রকাশ্যে ) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

( সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা। )

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্।

হেম। দাও। ( ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্। )

রমা। ( করযোড়ে )

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন!
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন!
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব-ভয়-হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি!
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন!
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তুভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

# যেওনা হেলায় চলে।

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায়!
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী?
ধরা সদা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত অমা-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায়! আজি যেগো বড় দূরে!
না পাই প্রবোধ হেন যা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা ভুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিঠুর আর!
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে-মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায়! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর!
প্রেমময়! দয়াময়! আমার হৃদয়-ধন!
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সংবল-সার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জ্বালা তোমার চরণ তলে। *

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

---

# ঔপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কলিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন;—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই কাগজ নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবস্থ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থা বড় কম শোচনীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্‌লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান। যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার আনাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতা-গুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝল্‌মলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের